৫

সমাজ-সমস্যা।

শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ।

প্রকাশক :—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু,

এক্সচেঞ্জ পাব্‌লিসিং কোম্পানী,—

১৫ নং মাণিকতলা—মেইন রোড্‌,

কলিকাতা।

সন ১৩২২ সাল।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,

মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ ;

৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উৎসর্গ

যাঁহারা, সেই বিশাল—বিপুল জনমণ্ডলী—যাহা সাক্ষাৎ বিরাট বিগ্রহ সদৃশ, তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তাঁহাদের—সেই চিন্তাশীল মহোদয়গণের করকমলে সমাজ সমস্যা সাদরে সমর্পিত হইল।

বিনীত—

যামিনী।

নিবেদন

আমি লেখক বলিয়া বাহাদুরী লইবার আশায় লেখনী ধারণ করিতেছি না, সে দুরাশা আমার নাই। সুতরাং প্রার্থনা করিতেছি, পাঠক-পাঠিকাগণ ভাষার ক্রটী মার্জ্জনা করিয়া পড়িলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ।

বিজ্ঞাপন

পাঠকপাঠিকাগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে চৌদ্দ-দিনের মধ্যে একযোগে তিন খানা পুস্তক প্রণয়ন এবং মুদ্রাঙ্কন শেষ করায় ভাষার দিকে বেশী দৃষ্টিপাত করিবার সময় হইল না এবং অনেক ভুলভ্রান্তিও রহিয়া গেল। সুতরাং প্রার্থনা, তাঁহারা ভাষার ক্রুটী এবং তৎসমুদয় মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

প্রকাশক।

যামিনী বাবুর

পুস্তকাবলী।

সমাজ-সমস্যা	...	...	১৲
সংসার-সমস্যা	...	...	১৲
শিক্ষা-সমস্যা	...	...	১৲
পৃথিবী ভ্রমণ	...	...	৩৲

প্রাপ্তিস্থান :—

এক্সচেঞ্জ পাব্‌লিসিং কোং

১৫ নং মাণিকতলা মে'ন রোড্‌,

কলিকাতা।

সমাজ-সমস্যা।

বর্ত্তমানেও বাংলার এই ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা অবলোকন করিলে নেহাতই মনে হয়, নিশ্চয়ই বাংলা ভগবান্-বিবর্জ্জিত ভগবান্-পরিত্যক্ত প্রদেশ। কোনও বিশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিবিধান স্বরূপ আজও এই মহাপ্রদেশ এই অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। তাই আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও, যখন পৃথিবীর অসভ্য দেশ—অসভ্য সমাজ পর্য্যন্ত কেবল মাত্র চেষ্টার ফলে, সুসভ্য দেশ ও সুসভ্য সমাজে পরিণত হইতে পারিল, উন্নতির উচ্চ সীমায় আরোহণ করিতে সক্ষম হইল, তখনও—আজ এই পর্য্যন্তও, বাংলা কেবল কতকগুলি কুসংস্কারের বোঝা মাথায় করিয়া, ভ্রমাত্মক স্বতন্ত্রতায় আপনাকে সম্পূর্ণ সরাইয়া লইয়া, এত চেষ্টা সত্ত্বেও, উন্নতির পথটী অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল। এ বঙ্গদেশ পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র, এমন কি ভারতবর্ষ হইতেও স্বতন্ত্র। এখানকার কোনও কিছু

দুনীয়ার কাহারও সঙ্গে মিলিবে না। দুনীয়া এক, বাংলা আর। মিলিবে কেন? অনশনে মরিবে, উপযুক্ত এবং পবিত্র পানীয় অভাবে রোগক্লিষ্ট কৃশকায় হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিবে, এবং অনাচারে ক্ষীণকায় ও অল্পায়ু হইবে, তাহাতেও রাজি, কিন্তু কুসংস্কার ত্যাগ করিতে পারিবে না। প্রতারিত, জর্জ্জরিত এবং নিষ্পেষিত ও নিঃশেষিত হইবে, তবু "ধোকার টাটী" ভাঙ্গিতে পারিবে না, সত্যের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, দুনীয়ার সঙ্গে মিশিতে পারিবে না। কি ভয়ঙ্কর সংস্কার! কি ভীষণ সমাজবন্ধন!! কি অসাধারণ, কিন্তু কি অন্যায় সমাজ-শাসন!!! এই বন্ধনের কল্যাণে কত রাজা-রাজ্‌ড়া, সম্রাট্-সুলতান, এবং পাদ্‌সা-পাঠান এদিক্ ওদিক্ হইয়া গেল, কিন্তু এ যেমন, ঠিক তেমনই আছে বটে, "মর্ম্মে মর্ম্মে বাঁধা আছে মরমের পাশে,"! এত যত্ন, এত চেষ্টা, এত নির্য্যাতন, এত প্রপীড়ন; কিন্তু তবু, হায়, বাঁধা যেন "মরমে মরমে।" সম্বন্ধ যেন শিরায় শিরায় মাথায় মাথায় এবং হাড়ে হাড়ে! কি ভীষণ! কিন্তু, কি অন্যায়! এবং উন্নতির পথে কি ভয়ঙ্কর অন্তরায়! বাংলার উন্নতি —বাংলার দুনীয়ায় একটী হইয়া দাঁড়ান—বাঙ্গালীর প্রকৃত উন্নতি —উন্নতির পথ প্রশস্ত হওয়া, সবই—এই এখানে—ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালী যদি উন্নতি চায়, বাঙ্গালী যদি বাঁচিতে চায়—যদি প্রকৃত স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিতে চায়, তবে সমুন্নত কু-সংস্কার সমুষ্টিকে সমূলে সমুৎপাটন করিতে হইবে, সমাজ-বন্ধন শিথিল করিতে হইবে, সমাজকে স্বাধীনতা দিতে হইবে।

কিন্তু, কে শুনে এ ক্রন্দন! কেউ যে নাই এখন এখানে! এ যে অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়! কিন্তু, উপায় নাই, ইহা ছাড়া এখন আর অন্য উপায় নাই। যে পর্য্যন্ত না সমাজ কু-সংস্কারমুক্ত হয়, যে পর্য্যন্ত না সমাজ পাপব্যাধি মুক্ত হয়, যে পর্য্যন্ত না সমাজের গলদ বাহির হইয়া যায়, যে পর্য্যন্ত না সমাজের বৃথা কিন্তু বড় কঠিন বাঁধন শিথিল হইয়া যায়, যে পর্য্যন্ত না সমাজ উন্নতির শিখরে আরোহণ করিবার পথ বিমুক্ত করিয়া দেয়, এক কথায়—যতক্ষণ না সামাজিক সমস্যাগুলির একটী একটী করিয়া মীমাংসা হয়, ততক্ষণ আমাদের এ রোদন ছাড়া আর উপায় নাই। রোদন করিতে হইবে, দেখিতে হইবে সমাজ কি? দেখাইতে হইবে সমাজে আছে কি? ভাবিতে হইবে কিরূপে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি, কি প্রকারে আমাদের যথার্থই মঙ্গল হইতে পারে। সতর্ক হইতে হইবে যেন আমরা মঙ্গল বলিয়া অমঙ্গলের না আহ্বান করিয়া বসি—যেন দীপ্ত শিখা দেখিয়া দিক্ ভুলিয়া না যাই—যেন আমরা অন্যকে দেখিয়া আত্মহারা না হই—যেন আমরা সুপথ ভাবিয়া কুপথে না যাই—যেন আমরা দেশী দেহে বিদেশী খোলস্ পরিয়া না বসি এবং যাহা আমাদের আঁতে, ধাতে এবং জল ও বায়ুতে খাটে, তাহাই যেন করিতে পারি। আর সেইটী করিতে হইলেই আপনাদিগের অবস্থাটা একটু বিশেষ করিয়া—একটু ভাল করিয়া দেখা দরকার। অন্যের ছেলেটী ভাল হ'ক তাহাতে আমার বিশেষ কিছু আসে যায় না, নিজের মন্দ ছেলেটী ভাল করিতে হইলে তাহারই দোষগুণগুলি বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া

তাহার দ্বারাই তাহাকে ভাল করিতে হইবে। অন্যের ভালছেলে দ্বারা হইবে না।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালী

বর্ত্তমানে বাঙ্গালীদের চেহারা দেখিলে বড় দুঃখ হয়। তাহাদের সেই কৃশ ছোটখাট দেহখানি, মাংসশূন্য সরু সরু, লম্বা লম্বা, হাত-পাগুলি, আর পরিদৃশ্যমান পঁজরের হাড় কয়খানির মধ্যে অতি নিম্ন বা অতি উচ্চ উদরবিশিষ্ট তনুখানি দেখিলে বড়ই দুঃখ হয় এবং একেবারে হতাশ হইতে হয়। কেবলই মাথাটী সার! একটু দূর হইতে দেখিলেই কেবল মাথাটী ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। যেন, শুদ্ধ একটী মাথাই, আর কিছুই নয়। দেখিলেই মনে হয় যেন ভগবান্ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত, অনুতপ্ত, ও একেবারে পরিত্যক্ত! শরীরে রক্ত নাই, মাংস নাই, শক্তি নাই হাত-পাগুলি কাঠি কাঠি, পেটটি টিনটিনে এবং মাথাটী সার। রাস্তায় চলিতে অন্য জাতীয় লোকের সঙ্গে বাঙ্গালীকে দেখিলে মনে হয়, যেন ছয় মাস পরে রোগী অন্ন পথ্য করিয়া এই প্রথম সান্ধ্য হাওয়ার জন্য বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। কেবলই সবে কয়দিন মাত্র রোগশয্যা ত্যাগ করিয়াছে। কেবল কয়েকটীমাত্র ছাড়া, বর্ত্তমানে অধিকাংশ বাঙ্গালীরই শারীরিক অবস্থা এইরূপ এবং ইহা নিত্য পরিদৃশ্যমান। কি ভীষণ দৃশ্য!

ইহাদিগকে দেখিলে চক্ষে জল আসে, নিরাশা আসিয়া হৃদয়ে অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলে; ভরসা হয় না যে বাঙ্গালী আর কখনও কিছু করিতে আশা করিতে পারে।

আমরা অনেকেই বলিয়া থাকি "বাঙ্গালীর সাহস নাই। আর সেইই ত দোষ; সাহস না থাকিলে কি কখনও কোনও কিছু হয়?" ঠিক কথা। সৎ কর্ম্ম কি অসৎ কর্ম্ম, যাহাই কেন হো'ক না, সম্পাদন করিতে হইলেই অগ্রে সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই আরম্ভ করিতে হয়, নইলে হয় না; সাহস সর্ব্বাগ্রে দরকার। আর বাঙ্গালীর সেই সাহসেরই অভাব! বাঙ্গালীর সাহস নাই। কিন্তু সাহস থাকিবে কিরূপে? সাহস থাকিবে কিসে? কিসের আশ্রয়ে? সাহসের আধার সামর্থ্য। শক্তির আশ্রয়ে সাহসের আবাসভূমি। সামর্থ্য না থাকিলে সাহস থাকিবে কিসে—কিরূপে? শরীরে শক্তি না থাকিলে সাহস থাকিবে কিরূপে? কাহার অধীনে বসত করিবে? বাঙ্গালীর সাহস নাই, ঠিক কথা। কিন্তু সাহস থাকে কিসে? বাঙ্গালী আজ যথার্থ ভেতো—না, শুধু তাই নয়,—"সেগো"—"বেলে"—"বাঙ্গালী"—হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালী ত এমন ছিল না। এই সে দিন নবাবের আমলের বাঙ্গালীদের চিত্র দেখিলেই ত দেখিতে পাই পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙ্গালীর চেহারা, আকার ও আয়তনে কিছুতেই কাহারো অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। এমন কি, আমাদের পিতা পিতামহদিগের চেহারা দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় এ বাঙ্গালী এমন ছিল না। এ পরিবর্ত্তন অতি অল্প দিনের, এ অধঃ-পতন অতি অল্প সময়ের। ইহা সে কালের নয়, এ কালের।

যাহাই হউক, যতদিন—আর যে কালেরই হো'ক্, তদ্দ্বারা, বাস্তবিক পক্ষে, এখন আর এমন বিশেষ কোনই দরকার নাই। কিন্তু

কি কারণে এই অধঃপতনের আরম্ভ হইয়াছে, এবং সেইটী বর্ত্তমানেও বিদ্যমান কি না তাহার অনুসন্ধান করাই সম্প্রতি নিতান্ত দরকার। কেন না, যদি আমরা আমাদের এই বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থাকে যথার্থই অধঃপতিত অবস্থা বলিয়া মনে করি এবং সংশোধনের বাসনাও বলবতী হইয়া থাকে, তবে বিদ্যমান কারণটীকে সমূলে অপসারিত করিতে পারিলেই অধঃপতনের পথ রুদ্ধ হইল এবং অন্য-দিকে সংশোধনের পথও উন্মুক্ত হইল। সুতরাং বর্ত্তমানে কেন আমরা এমন হইলাম, কিসে আমাদের এই শারীরিক অধঃপতন হইল, ইহার কারণ কি, ইহাই বাস্তবিক ভাবিবার বিষয়! কি কারণ?

বর্ত্তমান বাঙ্গালীর শারীরিক অবনতির মূল এবং প্রধান কারণ বাঙ্গালার বর্ত্তমান বিবাহপ্রথা। হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে, আজকালও যে প্রথা প্রায় অতর্কিত অবস্থায় চলিয়া আসিতেছে, যদি এই প্রথা আরও ৫০ কিংবা ১০০ বৎসর প্রচলিত থাকে, তবে আজ হইতে আর ১০০ শত কিংবা ১৫০ দেড় শত বৎসর পরে বাঙ্গালী-কলেবরের দৈর্ঘ্য ২॥ অথবা তিন হাতের বেশী হইতে পারিবে না। শুধু তাই নয়, তুলনায় তৎপরিমাণে হীনবল, ক্ষমতার হ্রাস এবং অল্পায়ুও, বোধ হয়, হইতে বাধ্য। ইহাই যদি হয়, বাস্তবিক তাহা হইলে কি দুঃখের বিষয়ই ইহা হইবে!

এখন দেখা যা'ক প্রথাটা কি? বলা বাহুল্য, প্রায় সকলেই জানেন বর্ত্তমান বিবাহপ্রথাটা কি? তাহা হইলে অনেকে বলিতে পারেন, হাতের বালা, আর আয়না দিয়ে দেখবার দরকার কি? তদুত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে অনেক সময় হাতের বালাও আয়না

দিয়ে দেখিতে হয়। যিনি না দেখিতে চাহেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি, দেখা যে উচিত ইহার কারণও দেখাইতে পারি, কিন্তু তাহাতেও অসম্মত হইলে আমাদের আর কিছু বলিবার বা করিবার নাই। কিন্তু যাই হউক, যাহাই করুন, বাল্যবিবাহপ্রথা যে বাঙ্গালীর দৈহিক অবনতির মূল কারণ তাহা অস্বীকার কারবার যো নাই।

বঙ্গে বাল্যবিবাহ বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেরই অন্তরায়। ইহা বাঙ্গালীর পুণ্য-পথের কণ্টক, ইহা পাপ —মহাপাপ!

পাপ কাহাকে বলে? প্রকৃতির গতিরোধ করা, মানে প্রাকৃতিক গতির বিরুদ্ধে যাওয়া অথবা প্রাকৃতিক গতিকে বাধা দেওয়ার নামই পাপ। আত্মার স্বভাব অনন্তর অপার আনন্দে কাল কর্ত্তন করা, ইহার বিরুদ্ধাচরণ পাপ। সাধু সদানন্দে থাকিতে ভালবাসে, তাঁহার তাহাতে প্রতিবাদ সাধন করা পাপ। নারী ঋতুবতী হইয়াছে, স্বামীসহবাসে সন্তান সম্ভাবনা, ইহার অন্যথা আচরণ করা পাপ। বালিকা যুবতী হইবে, যুবতী পূর্ণ কলেবরা হইবে, তৎপর স্বামীসহবাসান্তে পূর্ণ অবয়বসম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সন্তান প্রসব করিবে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ কি পাপ নয়? অফুটন্ত কোমল কোরকে আঘাত কর, আর সে সম্পূর্ণ সুন্দররূপে ফুটিতে পারিবে না, লাবণ্যলতাকে জোর করিয়া আলো কিংবা তাপের অন্তরালে রক্ষা কর সে বিবর্ণ মলিন হইয়া যাইবে। চারাগাছের মাথায় পাথর চাপা দিয়া রাখ, সে আর বাড়িবে না। অপ্রাপ্ত

বয়স্কা, অসম্পন্ন অবয়বা অফুটন্ত কিশোরীর অঙ্গে অন্যায় আঘাত কর, সে কিরূপে বাড়িবে? সে কিরূপে সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দীর্ঘায়ু সন্তান প্রসব করিবে? সে সন্তানকে কিরূপে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হইতে আশা করিতে পার? অসম্পন্ন শরীর হইতে উৎপন্নকে কিরূপে সম্পন্ন হইতে আশা করিতে পার? একি প্রকৃতির গতির বিরুদ্ধাচরণ নয়? একি প্রাকৃতিক গতিকে বাধা দেওয়া নয়? এ কি মহাপাপ নয়? ইহাই প্রকৃতির প্রাকৃতিক গতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, ইহাই অপ্রাকৃতিক, ইহাই মহাপাপ। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান বাল্যবিবাহপ্রথা মহাপাপ। বাঙ্গালী ইহার পাপ ফলও হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতেছে। এবং বাঙ্গালীর দৈহিক অবনতিরূপ ফল ইহার প্রধান এবং অদ্বিতীয় ফল। কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলা ভাল। ৮ আট কিংবা দশ বৎসরের বড় জোর বার, তের অথবা চৌদ্দ বৎসরের বালিকাকে সামাজিক রীতি অনুসারে মান মর্য্যাদা, কুল-কলঙ্কের এবং লোক-নিন্দার ভয়ে কন্যাদায়-বিপদ্‌-গ্রস্ত ভীত পিতা যথাসর্ব্বস্ব অন্ত করিয়া অর্থলোলুপ অপরিণামদর্শী পিতার ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, কিংবা কুড়ি বৎসর বয়স্ক পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন। কন্যা পাত্রস্থ হইল, পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভ করা হইল না। কন্যার পিতা কখনও দায় মুক্ত হয় না, অন্ততঃ হিন্দুসমাজে ত নয়। কন্যা পাত্রস্থ হইল বটে, তাহা হইলেও তাহার এখনও আরও অনেক প্রকার "দায়"এ দায়ী হইবার রহিল। কন্যার পিতার মুক্তি কোথায়? যাক, সে অনেক কথা, আমরা এখন সে কথা

আলোচনা করিতে বসি নাই। এখানে অত কথা বলিবার সময় হইবে না।

যাই হোক, কন্যা পাত্রস্থ হইল। কিন্তু পাত্র কি—কেমন? কেহ বা স্কুলের ছাত্র,—কেহ বা কলেজ ক্যারী করিতেছেন, কেউ না হয় আইন দেখিতেছেন, আর কেউ বা বড় জোর ২০৲ ২৫৲ ৩০৲ কিংবা ৪০৲ টাকা বেতনে কোন প্রকার কেরাণীগিরী কি স্কুলমাষ্টারী করিতেছেন। বিবাহান্তে অনেকেই স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। আর দেওয়াটা নেহাত অন্যায়—অপ্রাকৃতিকও বলিতে পারা যায় না। বই (পুস্তক) আর বউ (স্ত্রী) বাস্তবিকই এক সঙ্গে পড়া হয় না, হইলেও তেমন হয় না। প্রবাদ বাক্যটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। যাহাই হউক, বই পড়েন আর নাই পড়েন, বউ পড়িতে নিশ্চেষ্ট থাকেন না। অশিক্ষিত অসংযত, সংযমশূন্য যুবক অপ্রাপ্তবয়স্কা, অসম্পন্ন ও অসম্পূর্ণঅবয়বা অজ্ঞ বালিকার সহিত অকালে অকুতোভয়ে দাম্পত্য-প্রণয়-প্রতিদান আরম্ভ করিল। অসম্পূর্ণ অঙ্গে অকালে আঘাত করিল, প্রকৃতির প্রাকৃতিক গতি বাধা পাইল, আর বৃদ্ধি পাইল না, আর বাড়িল না, অসম্পূর্ণ অঙ্গে আর সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিল না। অসম্পন্ন অবয়ব সম্পন্ন হইবার সুযোগ আর হইল না। প্রকৃতির গতি রোধ হইল, যুবতীর যৌবন আর সম্পূর্ণ বিকসিত হইতে পারিল না।

কিন্তু কে দেখে তাহা? কে বিচার করে তাহা? অবসর কোথায়? প্রয়োজন কি? কেন করিবে? যুবতী বধূ স্বয়ং তাহার

কি সর্ব্বনাশ হইল তাহা বুঝিতে পারিল না। সময় পাইল, দুই দিন পাছের সময় দুই দিন আগে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইল, অকালে সন্তান সম্ভাবনা হইল। যথাসময়ে নিস্তেজ, হীনবীর্য্য, অল্পায়ু সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। পিতা সকালে পুত্রমুখ দর্শনে পুন্নাম নরক হইতে মুক্ত হইলেন, পিতামহ সকাল সকাল পৌত্র মুখ দর্শন করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সবই ভাল, সবই সুখের কথা। ইহার মধ্যে অসুখের—অমঙ্গলের, অল্পায়ু কিংবা অন্য কোনও প্রকার অনিষ্ট চিন্তার সময় বা সুযোগ কোথায়! সকলেই সুখী, কে অসুখের চিন্তা করিবে। কে দায়ে পড়িয়াছে? আর, তার পর—কি দরকার?

পাপ প্রথা এই প্রকারে পুণ্যের আবরণে অলক্ষিতে অতর্কিত পদে আস্তে আস্তে আপনার পথে চলিয়া যাইতেছে, আপনার কাজ করিতেছে, যেরূপ ফল ফলিবার তাহা ফলাইয়াছে এবং ফলাইতেছে। কেহ দেখিয়াও দেখিতেছে না, শুনিয়াও শুনিতেছে না, ভাবিতেছেও না; নিরাপত্তিতে নির্ব্বিবাদে বিনা বাক্যব্যয়ে কুপ্রথার কুফল সুফলজ্ঞানে ভোগ করিতেছে। একটীবার ভাবিবার, বুঝিবার কিংবা দেখিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই। সমস্ত বাঙ্গালী জাতি যে একবারে ধ্বংসের পথে দাঁড়াইয়াছে, একবারে যে অধঃপাতে যাইতেছে, পাপ-প্রথা যে একেবারে তাহাদিগকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তাহা তাহারা দেখিতেছে না। তবে কে দেখিবে? কে ভাবিবে? বাঙ্গালীদের উত্থান-পতন, মঙ্গল-অমঙ্গল, উন্নতি-অবনতির জন্য কে দায়ী? কাহারা দায়ী? সমাজের অন্যায় অত্যাচারের জন্য

কে দায়ী? কে সমাজ, কাহার সমাজ? কাহাদের লইয়া সমাজ? সমাজ কাহাদের? কে তাহারা? বাঙ্গালী নয়? তবে কে দায়ী? বাঙ্গালীর মঙ্গলামঙ্গলের জন্য—বাঙ্গালার জন্য কে দায়ী? এই অনাচার, অবিচার এবং অত্যাচারের জন্য দায়ী কে? এই আত্মঘাতী প্রথার প্রবর্ত্তন কে করিল?

বলা বাহুল্য, এই প্রথার প্রবর্ত্তন আমরাই করিয়াছি; মানে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ ইহার প্রবর্ত্তক। তাহা হইলে, প্রশ্ন হইতে পারে (এবং অনেক সময়ই হইয়া থাকে) যে, আমাদেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ কিরূপে আমাদের জন্য এমন প্রথার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গেলেন, যাহা অবশেষে আমাদের এমন সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইল? ইহাও কি সম্ভব যে তাঁহারা আমাদের যাহাতে অমঙ্গল হইতে পারে এমন কিছু করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন? অনেকেই বিশ্বাস করেন না, করিতে চাহেন না, পারেন না যে তাঁহারা আমাদের যাহাতে অমঙ্গল হইতে পারে এরূপ কিছু করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস যে আমরা যে সব পবর্ত্তিত প্রথা বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজে অবলোকন করিতেছি ইহার প্রত্যেকটীই, এমন কি এখনও, আমাদের মঙ্গলের জন্য; কাজেকাজেই প্রবর্ত্তিত প্রথার বিরুদ্ধে যে কোন প্রকার প্রশ্নের উত্থাপন হইবামাত্রেই তাঁহারা "তবে কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি আমাদের চেয়ে অনুন্নত কিংবা অধম ছিলেন? আমরা কি তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছি?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া থাকেন? কিন্তু আসল কথা কেহই একবারও ভাবিয়া দেখেন না। তখন আর এখন, সে সমাজ আর

এ সমাজ, সে মানুষ আর এ মানুষ, এবং সে কালের আর এ কালের শিক্ষার কি প্রভেদ, এ সব কিছুই ভাবিয়া দেখেন না। বোধ হয় দেখিতেও চাহেন না।

বাল্য-বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তনের কারণ।

হিন্দু-বিবাহটা একটা খেলাখেলির ব্যাপার নয়, এটা একটা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ভাবিবার বিষয়। বিশেষরূপে বহন করার নাম বিবাহ। এখানে বিবাহ অর্থ বিলাস কিংবা ভোগ নয়। স্ত্রী এখানে কেবলমাত্র ভালবাসার, বিলাস অথবা ভোগের সামগ্রী নয়। সে এখানে অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী এবং গৃহলক্ষ্মী। এখানে গ্রহণ আছে ত্যাগ নাই, জীবন আছে মরণ নাই, প্রেম আছে বিচ্ছেদ নাই। স্ত্রী এখানে শুধু প্রণয়িনী নহে, অর্দ্ধাঙ্গিনী—সংসারধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী। এমনই বটে! ইহাকে বলে বিবাহ, এবং ইহাই আর্য্যঋষিগণের কল্পনা ও ধারণা।

* * * *

আর, এই বিবাহের উদ্দেশ্য—উত্তেজনার উপশান্তি করা নয়, বিলাসের বিষম বাসনা পরিতৃপ্তি করা নয়, প্রণয়ের সুখসাগরে আহ্নিক করা নয়, প্রমোদকাননে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমাভিনয় করা নয়, উচ্ছৃঙ্খলা কি বিচ্ছৃঙ্খলা নয়, পরিত্যাগ কি পরিতাপও নয়। একটী বিশাল সংসার-তরুর সংস্থাপন করাই এই বিবাহের উদ্দেশ্য। স্বামী এবং স্ত্রীর সংযোগই এই বৃক্ষের সংস্থাপন। মানে "স্বামী + স্ত্রী = সংসার।" এই বিবাহ

হইতেই এত বড় বড় সংসারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ, সুতরাং লোকে ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ এবং প্রকৃতপক্ষে স্বামীকে স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গ এবং স্ত্রীকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া থাকে এবং আজও, অন্ততঃ মুখে, হিন্দুগণ বলে।

আর সংসার, শুদ্ধ সংসার হইলেই হইল না। ইহার উন্নতি-অবনতি, মঙ্গল-অমঙ্গল, শিক্ষা-অশিক্ষা, সুশিক্ষা-কুশিক্ষা, আয়, ব্যয়, স্থিতি এবং সর্ব্বশেষে ধর্ম্ম, এ সমুদয় এই আবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের উপর নির্ভর করে। বিষয়টী বড় গুরুতর, কেননা, সংসারধর্ম্ম বড় কঠিন কর্ম্ম। কারণ, এ শুদ্ধ সংসার নয়, আবার ধর্ম্মও আছে।

সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে স্বামী এবং স্ত্রী ঠিক অর্দ্ধাঙ্গ হওয়া উচিত, নতুবা সংসারযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা হয় না, হইতে পারে না। অতএব সংসারে সফলকাম হওয়াও দুরূহ হইয়া উঠে। সুতরাং সংসার-ধর্ম্ম পালন করা অসম্ভব। সেই জন্য আর্য্যগণ হিন্দুসমাজে বাল্য-বিবাহ প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবার সহিত ৮ বৎসর বয়স্কা বালিকার বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মানে ২৫ পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত পালনান্তে শিক্ষিত সংযমী যুবা যখন সংসারে প্রবেশ করিবে তখন আট বৎসর মাত্র বয়স্কা কাঁচা মাটী সদৃশ বালিকাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া আপনার স্বভাব ও শিক্ষানুযায়ী স্ত্রীটীকে গঠন করিয়া লইতেন; ভবিষ্যতে সংসারে শ্মশানের ভীষণ বিভীষিকা দর্শনের সম্ভাবনা মাত্র রাখিতেন না। সংসারযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ

হইত। সংসারীরা সংসারধর্ম্মের উপযুক্ত ফল লাভ করিতেন। ইহাই সংসারীদের পার্থিব এবং বাল্যবিবাহের উদ্দেশ্য।

কিন্তু সে কাল আর নাই, সে সমাজ, শিক্ষা কিংবা সংযম কিছুই আর নাই। তবে সে কালের সে প্রথা থাকিবে কেন? থাকিলেও সে প্রথা আর উপকারী হইবে কিরূপে? যে ভিত্তির উপর এই প্রকাণ্ড সত্যটা দাঁড়াইয়াছিল, সে ভিত্তি যদি না থাকে, তবে কি সে সত্য আর দাঁড়াইতে পারে? তাহা পারে না, পারিতেছেও না। তাই যে বাল্য-বিবাহ-প্রথা একদিন এ দেশের ইষ্টের কারণ ছিল, আজ সেই বাল্য-বিবাহ প্রথা এদেশের, এ সমাজের, এ জাতির, মহানিষ্ট সাধন করিতেছে। যাহা এক কালে এদেশের লোকের মঙ্গলসাধন করিয়াছে, আজ কাল ক্রমে তাহাই এদেশবাসীর সর্ব্ব-নাশের মূলসূত্র। তখন সংযম ছিল এখন সংযম নাই। তখন আত্ম-বিশ্বাস ছিল, এখন নাই; সৎসাহস ছিল, এখন নাই। তখন আত্ম-নির্ভরতা ছিল. এখন নাই। তবে এ প্রথা দাঁড়ায় কিসের উপর? তবে সেই সে দিনের প্রথা আজ এ দিনে উপকার করিবে কি করিয়া? তবে কি হইবে—কি করিবে? কি কর্ত্তব্য?

বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য কি?

বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। সমাজ সংস্কার—প্রথার পরিবর্ত্তন, একান্ত প্রয়োজন। এ কথা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন ও স্বীকার করিতেছেন। তবে কেবলমাত্র কতকগুলি লোক গোড়ামিও একগুঁয়েমি করিয়া মনুর

দোহাই দিয়া নিজদিগকে শাস্ত্রসর্ব্বস্ব জানাইয়া দরকারী সংস্কারকে দিন দিনই সুদূরে তাড়াইয়া দিতেছেন। নিকট কর্ত্তব্য এইরূপে কেবল দূরেই সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মনু কি ? মনুর আদেশ কি ? শাস্ত্র কি ? শাস্ত্রোক্ত বিষয় কি ? শাস্ত্র কিরূপভাবে পূর্ব্বাপর গঠিত ও প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না এবং এমন কি আজও ভাবিয়া দেখিতে চান না। তাঁহারা পড়ার অনুরোধে শাস্ত্র পড়িয়াছেন এবং পণ্ডিতির অনুরোধে শাস্ত্রোক্ত কতকটী শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছেন ; দরকার হইলেই কণ্ঠস্থ শ্লোক সকল আওড়াইয়া আপনাদের শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেন। যদিও তাঁহাদের অনেকেই সেই সমস্ত শ্লোকের ও ভাবার্থ ভালরূপ অনুধাবনা করিতে অক্ষম। তাঁহারা কথায় কথায়ই শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্র যে সময়-অনুযায়ী অনুশাসন-লিপি এ কথা তাঁহারা একবারও মনে করিতে পারেন না। কেন না, বোধ হয় এ কথা তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না—বুঝিতে চেষ্টাও করেন না।

শাস্ত্র একটুখানি জিনিস নয়, এক নিঃশ্বাসের একটী মাত্র কথাও নয়, ইহা অতি বড় যুগযুগান্তরব্যাপী পুরুষপরম্পরার কর্ম্ম। ইহা একদিনেই সৃষ্টি হয় নাই, অনেক দিনে হইয়াছে। এক-জনে করে নাই, অনেকে করিয়াছে। ইহাতে এক মনুর মাথা নয়, অনেক মনুর মাথা। ইহা এক সমাজের বিধি নয়, অনেক সমাজের বিধি। দেশ কাল পাত্র ভেদে পুরুষপরম্পরাক্রমে মানুষ যেমন নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে,

জনসমষ্টি মানব সমাজও তদ্রূপ নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। জনসমষ্টিই সমাজ। আর সমাজসংস্কারকগণও দেশ, দেশের লোক এবং সময়ের গতি বিধির বিষয় বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রগুলিও ঠিক সেই ভাবে গঠিত করিয়াছেন। যিনি যখনই দেশের ভিতর সার্ব্বভৌমিক ক্ষমতা পাইয়াছেন তিনিই তখনই দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, কালের গতি ও লোকের চরিত্রের গতি বুঝিয়া, তদনুযায়ী সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন ও যথা কর্ত্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমুদয়ই শাস্ত্র এবং ইহাদের প্রণেতারাই শাস্ত্রকার মনু।

তাহা হইলেই দেখা যায় যে শাস্ত্র সকল পরিবর্ত্তনশীল। দেশ কাল পাত্রানুযায়ী সময় সময়ই তাহারা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অর্থাৎ দেশের অবস্থা, দেশের লোকের মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন সময়ের গতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া সেই সময়ের উপযুক্ত পণ্ডিতগণ শাস্ত্র সমুদয়ের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকিতেন। যদি তাহাই ঠিক হয়, তবে এই দুর্দ্দিনে কি আর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনশীল শাস্ত্র পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না? দেশের বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন যে দরকার, ইহা কি বুঝিতে পারেন না? আর যদি বুঝিতে পারেন, তবে এই বিধির পরিবর্ত্তন ব্যবস্থা দেওয়া কি তাঁহাদের উচিত নয়? ভগ্ন স্তূপকে ধরিয়া রাখিতে গিয়া আত্মহত্যা করা অপেক্ষা সময়ে জীর্ণ সংস্কার করা কি কর্ত্তব্য নয়?

কালবশে যাহা কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া অথবা রূপান্তরিত করিয়া নূতন শাস্ত্রের প্রণয়ন, অথবা নূতনরূপে প্রদর্শন করিতে কি তাঁহারা সক্ষম নন্? অথবা সাহসী নন্? যদি না হ'ন, কিংবা না পারেন, তবে তাঁহাদের, দেশের এবং দশের পক্ষে মঙ্গল যে, তাঁহারা অবসর গ্রহণ করুন, স্থান মুক্ত করুন, আর একালে অকর্ম্মণ্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কালহরণ করিবেন না। আর দেশকে উৎসন্ন করিবেন না। অনেক হইয়াছে, আর দরকার নাই। সাহস থাকে, ক্ষমতা থাকে, অগ্রসর হউন; যাহা লোকে চায়, যাহা সময়ের দাবী এবং যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করুন। সমাজ সংস্কারিত হউক, দেশের লোক নূতন শক্তি, নূতন উদ্যমে অনুপ্রাণিত হউক, দেশের মঙ্গল হউক। আর না পারেন, জীর্ণ সূত্র ছেড়ে দিন্। বৃথা সমাজের নেতৃত্ব পদের দাবী করিবেন না। সমাজ উপযুক্ত নেতা খুঁজিয়া লইবে। আর পারেন তো—সাহস হয় তো, আসুন, হিন্দু মাত্রেই অবনত মস্তকে পায়ের ধূলি মাথায় লইবে—মাথার মণি মাথায়ই থাকিবেন।

সমাজে সত্যের অভাব।

বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে, দেখা যায় যে অনেকেই সত্য কথা বলিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। কেউ বা লোভে, কেউ বা ক্ষোভে, আর কেউ বা খাতিরে, কেউ বা প্রাণের ভয়ে, কেউ বা পদমর্য্যাদার খাতিরে, অথবা কেউ বা চাকরীর দায়ে সত্য কথা বলিতে অপারগ। অন্ততঃ ইহাই উক্তি। নেহাত ঠেকিয়া না পড়িলে

অন্যায় করিয়া তাহা স্বীকার করিতে রাজি হন্ না কিংবা হইতে পারেন না। সেই ক্ষমতা—সেই সত্য কথা বলিবার ক্ষমতা—স্পর্দ্ধা, তাঁহাদের নাই। সেই সৎসাহস প্রায়ই তাঁহাদের হয় না। হিন্দু সামাজিক শাস্ত্রানুযায়ী, "অখাদ্য" খাইতে হয় বলিয়া কেহ সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে গমন করেন না, অথবা করিবার সুযোগ পান না। কেন না, সমুদ্রযাত্রা করিলে অখাদ্য খাইতে হয়, (ইহাই এখনও বদ্ধমূল ধারণা) জাতি যায়; সুতরাং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সমাজ আর তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন না। অতএব তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া স্বজনগণের স্নেহ-মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া চিরকালের জন্য একা হয়ে থাকিতে হইবে। মানে, এক কথায়, প্রায় তাহাকে মরিতেই হইবে। কেন না, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া একা হ'য়ে থাকাও যে কথা, মৃত্যুও প্রায় সেই কথা। মৃত্যু মানে সম্বন্ধ ত্যাগ। যাহাই হউক, কাজে কাজেই, লোকে সহজে সমুদ্রযাত্রার কথা ভাবিতে পারে না, সমুদ্রযাত্রা করিতেও পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে অখাদ্য ভক্ষণের ভয়ে সমুদ্রযাত্রায় বিঘ্ন বাধা জন্মে, আজ অনেকেই, ঘরে—সমাজে থাকিয়া, সমাজের বুকের উপর বসিয়া, সমাজের চক্ষের সম্মুখে সেই সমুদয় অখাদ্য ভক্ষণ করিতেছেন। সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, শুনিয়াও শুনিতেছেন না। এমন কি, এ বিষয় ভাবিবারও সময় পাইতেছেন না। কিন্তু যেমনই সমুদ্রযাত্রার কথা হইল, সমাজ অমনই তাঁহার সমুজ্জ্বল সর্ব্বদা প্রস্তুত খাড়া দেখাইলেন, আর সব ঠিক! কি আশ্চর্য্য!

একখানে না খাইলেও খাইয়াছে, আর এক দিকে খাইয়াও খায় নাই, একদিকে দোষ না করিয়াও দোষী, অপর দিকে দোষ করিয়াও দোষী নয়; একদিকে পাপ না করিয়াও পাপী, অপর দিকে পাপ করিয়াও পুণ্যবান্; একদিকে অহিন্দুর ন্যায় আহার করিয়াও হিন্দু, অপরদিকে প্রাণে প্রাণে হিন্দু থাকিয়াও অহিন্দু; একদিকে অধর্ম্ম না করিয়াও অধর্ম্মী, অপরদিকে ধর্ম্মের মস্তকে পুনঃপুনঃ পদাঘাত করিয়াও ধর্ম্মশীল; একদিকে অসত্য বলিয়া সাধু, অপর-দিকে সত্য বলিয়া অসাধু; একদিকে সমাজের শিরে বজ্রাঘাত করিয়াও সামাজিক, অন্যদিকে প্রাণপাত করিয়াও পরিত্যাজ্য; একদিকে সত্য, অপর দিকে অসত্য--মিথ্যা প্রবঞ্চনা! কি আশ্চর্য্য!

কিন্তু একি সত্যের অপলাপ নহে? একি সমাজের অধঃপাতে যাইবার পথ নহে? একি অধর্ম্ম নহে? বেশ্যালয়ে যাইয়া বেশ্যার সহিত একত্রে এক পাত্রে সুরাপান ও মুরগীর মাংস ভোজন করায় যদি জাতি না যায়, হিন্দুগৃহে হিন্দুর বধূ মুরগীর মাংসের চর্চরী করিলে, আর, বিশেষ, সমাজেও যদি সে কথা অবিদিত না থাকে, তাহাতেও যদি সমাজচ্যুত হইতে না হয়, তবে বিলাত যাইতে বাধা কেন? ঘরে বসিয়া অখাদ্য খাইতেছি, সমাজ তাহা দেখিতেছে, জানিতেছে; বিশেষ, আমিও তাহা অস্বীকার করিতেছি না, কেননা দরকার হয় না, কিন্তু এ সকলে কোনও দোষ নাই; কারণ আমি যে এ সব করিয়া থাকি তাহার প্রমাণ কি? আমি অখাদ্য খাই, স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমি 'না' করিলে, আমি যে খাই, তাহার প্রমাণ কি? মানে আমি মিথ্যা বলিতে পারি; সুতরাং যাহা খুসি করিতে পারি।

আসল কথাটা এই যে, সমাজের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, যাহা ইচ্ছা তাহা খাও, যথা ইচ্ছা তথা যাও, এবং, এমন কি, সেসব সম্বন্ধে গল্প গুজব কর, তাহাতেও কোনও হানি নাই, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে, বলিও, করি নাই, খাই নাই কিংবা যাই নাই, তবেই হইল।" অখাদ্য খাও দোষ নাই, কিন্তু বলিও না; অগম্যা গমন কর, হানি কি? সবই প্রাকৃতিক। কিন্তু প্রকাশ করিও না। কুকর্ম্ম কর, কোনও ক্ষতি কিংবা পাপ নাই, কিন্তু প্রকাশ করিও না। এবম্প্রকার বিষয় বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে নিত্য পরিদৃশ্যমান। এ সব কি? এই সবগুলিকে কি বলিব? সত্য কোথায়? একি সত্যের অভিনয়?

আর এক কথা—হিন্দু বিধবাবিবাহ। বলা বাহুল্য, আমরাও বলি না যে বিধবাদিগকে বিবাহ দিতেই হইবে। কেননা, আমরাও এ বিষয়টী ধারণায়ও আনিতে অসমর্থ; এবং বোধ হয় হিন্দুমাত্রেই এইরূপ হইবে কিম্বা হয়। কিন্তু বলিতে চাই কি, যে সামাজিক শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত জন্মিবার আশঙ্কায় এবং অবিবাহিতাদের সংখ্যা অধিক বিধায় হিন্দু বিধবাদিগের দ্বিতীয় বার বিবাহপ্রথা বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহাদিগের সংযমী হইবার জন্য নানা প্রকার উপায় নির্ণয় করা হইয়াছে, এবং ইহাও ঠিক যে, অনেকে তৎসমুদয় উপায় অবলম্বন করিয়া সংযমী হইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং হইতেছেন। কিন্তু অনেক বাল-বিধবারই, যদিও বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়, অন্ততঃ যৌবনে যে একবার পদস্খলন হয় বা পদকম্পিত হয় তাহার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ২৭০৯৫
পরিগ্রহণ সংখ্যা ... ২১

আর, বিশেষতঃ ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। কাশী, নবদ্বীপ, নৈহাটী এবং আর আর তীর্থস্থানে তীর্থবাসী কুমারী বা কুমারী-বেশধারিণী বিধবাদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই বিষয়টী ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। এমন কি দেশেও অনেক সময়ই দেখা যায়, অনেক চক্রবর্ত্তী কিংবা ভট্টাচার্য্য ঠাকুর বিবাহের পরিবর্ত্তে কামারনী কুমারনী কিংবা তাইতানী পরিচারিকারূপে রাখিয়া গৃহিণীর অভাব পূরণ করেন। এতদ্বাদে কামার, কুমার, সূতার, মালী, তেলী ও কুলী জাতির মধ্যে "বিধবা রাখা" ত প্রচলিতই হইয়াছে। দক্ষিণার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণকে কিছু উৎকোচ দিয়া একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ দিলেই মিটে গেল। অর্দ্ধব্যয়ে অর্দ্ধবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল, নির্ব্বিঘ্নে বিবাহিত জীবন চলিতে লাগিল। বিবাহের বাকী রহিল কি? এই সমুদয় বিধবারা বিবাহিত জীবনের কোনও কর্ম্ম বাকি রাখে না, রাখিতে পারেও না। কেন না, উদ্দেশ্যই বিবাহসুখ। সুতরাং সবই হয়। কেবল হয় না কি? সন্তান রক্ষা। বিবাহিত জীবনের সমস্ত ফলই ভোগ করা হয়; শয়ন, ভোজন, আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ, সবই হয়; হয় না কেবল সন্তান রক্ষা। সন্তান রক্ষা করা হয় না, তৎপরিবর্ত্তে রাশি রাশি বধ করা হয়। হয় গর্ভেই বিনাশ করা হয়, নতুবা হওয়া মাত্র বিষ প্রয়োগ অথবা অন্য কোনও প্রকারে হত্যা করা হয়। ইহা ছাড়া গুপ্ত প্রণয়ের গুপ্ত রহস্য ত আরও ভীষণ! আরও ভয়ানক! এ সবই সমাজ জানে, নিত্যই দেখিয়া আসিতেছে; কেন না, এ

সবগুলি অতি সাধারণ, হামেসাই হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সমাজ এ বেলায় অন্ধ—বধির; এ সমুদয়গুলি দেখিয়াও দেখিতেছে না, শুনিয়াও শুনিতেছে না। কেন না, বিবাহ ত আর করে নাই। সামাজিক নিয়ম তো আর ভাঙ্গে নাই! ভ্রূণহত্যা হইতেছে, হোক; জীবহত্যা হইতেছে ক্ষতি নাই; সমাজে পুণ্যের নামে পাপের পসার দিন দিন বাড়িয়া চলুক, দোষ কি? একবার গঙ্গাস্নান করিলেই মিটিয়া যাইবে। বিধবা রাখা চলুক, ভ্রূণহত্যা হোক, প্রাণী বিনাশ হোক, হানি নাই, কিন্তু সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন না হইলেই হইল। ত'াহলেই নির্দ্দোষ—বেকসুর খালাস! কিন্তু সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন না হইলেই হইল। করিয়াছে ত করিয়াছে. সমাজে ত স্বীকার করে নাই, সমাজ ত মানিয়া লয় নাই! তবে আর কি দোষ? বিবাহিত জীবনের সর্ব্ববিধ কাজ কর্ম্ম সমাধা কর, কোনও দোষ নাই, কিন্তু বিবাহ করিও না। যথা ইচ্ছা গমন কর, ক্ষতি নাই, বলিও না; 'তুমি যথা ইচ্ছা যাও; যাহা ইচ্ছা খাও, কিন্তু বলিও না, জাতি যাইবে।' ইহাকে, কি প্রকার সমাজশাসন বলে? ইহার অর্থ কি? ইহা দ্বারা কি বুঝিব? এই সমুদয় নিষেধ বাক্য দ্বারা কি প্রমাণ হয়? ইহা দ্বারা কি এই বুঝিব—এ সব কি এই প্রমাণ দিতেছে এবং ইহার অর্থ কি এই, যে, এ সব মিথ্যা, সব অপ্রাকৃতিক, সব অন্যায়, সব ভুয়া? কোনও দিন হয় তো সময়ানুযায়ী—এই অপ্রাকৃতিক অন্যায় বিধি ব্যবস্থা, হ'তে পারে, একদিন সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছে, হ'তে পারে ইহা একদিন সমাজের মহা ইষ্ট সাধন করিয়াছে, কিন্তু আজ ইহা কি

করিতেছে? আজ ইহা কি উপকার করিতেছে? আজ ইহার কি ফল? মিথ্যা প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য একটা অত বড় জাতকে শ্মশানের মুখে তুলিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! অজ্ঞ, অভাজন, মূর্খ আমরা, আজও অবোধের ন্যায় সেই অন্যায়, অপ্রাকৃত জীর্ণ সূত্র কেবলমাত্র অলস শাস্ত্রের দোহাই দিয়া টানিয়া আসিতেছি। আমরা এমনই হইয়াছি, আমাদিগকে এমনই করিয়াছ!

কিন্তু আর কতকাল? আর কতকাল 'অসহায়'কে 'ন্যায়' এর মূর্ত্তিতে প্রদর্শিত করিবে? কত দিন আর মিথ্যাকে সত্যের আবরণে ঢাকিয়া, রাখিবে? কত দিন আর সত্যের অপলাপ করিয়া মিথ্যার ব্যবসায় করিবে? কত দিন আর অগ্নিকে বস্ত্রাচ্ছাদিত রাখিবে? কত দিন আর সত্য গোপন করিয়া রাখিবে? কি ফল? কি লাভ করিতেছ? সুধু মিছামিছি মিথ্যার ব্যবসায় করিয়া একটা বিরাট্ সমাজ, একটা অতুলনীয় শক্তিশালী জাতি, একটা অত বড় দেশকে একেবারে উৎসন্নের মুখে—একেবারে অধঃপাতের পথে—একেবারে ছারখারে উঠাইয়া দিলে। ধন্য তোমাদের মহিমা! ধন্য তোমাদের শাস্ত্র! ধন্য তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞান! ধন্য তোমাদের শাস্ত্রবিচার ক্ষমতা! আর ধন্য তোমাদের ন্যায়পরায়ণতা! আর সর্ব্বশেষে, ধন্য তোমাদের সত্যানুরাগ এবং সৎসাহসের! কিন্তু মনে রাখিও, যাহা প্রকৃত তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য এবং তাহাই চিরস্থায়ী। আর সেই 'প্রকৃতে'র পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ ভিত্তি ও সারতত্ত্ব। সুতরাং বৃথা আর অন্যায় অনুশাসনের

জীর্ণ-সূত্র ধরিয়া টানাটানি করিয়া প্রাধান্যতা বজায় রাখার চেষ্টা না করিয়া, সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করত নূতন কিন্তু প্রাকৃতিক সূত্র অবলম্বনে প্রাধান্যতা লাভের প্রয়াসী হইলে সমাজ রক্ষা পায়, দেশের এবং দশের মঙ্গল হয়। দেশ নিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কোন্‌টা কর্ত্তব্য? কি কর্ত্তব্য? কি করিবে?

বিশেষতঃ এই জীর্ণসূত্র ধরিয়া আসিয়া আর ফল কি? লাভ কি? কি আশা? ইহাতে কি সমাজের কোনও উপকার হইতেছে? সমাজ কি ইহা দ্বারা কোনও রূপে লাভবান্ হইতেছে? জাতীয় জীবনের কি ইহাদ্বারা কোনও উপকার কিংবা উন্নতিসাধন করা হইতেছে? জীর্ণসূত্র ধরিয়া থাকায় কি হইতেছে? উপকার কি অপকার? শারীরিক কিংবা মানসিক? ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক? উত্তর? কিছুই না। কোনও লাভ হইতেছে না; কোনও উপকার হইতেছে না। না লৌকিক, না পারলৌকিক। কিছুই হইতে পারে না। কেন না, যাহা অপ্রাকৃত—অসত্য এবং অন্যায় তাহা দ্বারা কখনও কোনও উপকার কিংবা উন্নতি হয় নাই, হয় না, হইবে না। সাময়িক উপকার কিংবা উন্নতি হইলেও স্থায়ী কোনওরূপ উপকার কিংবা উন্নতি হইতে পারে না। কখনও হয় নাই। কোনও দিন হইবেও না। অসত্য যাহা, অপ্রাকৃত যাহা, অন্যায় যাহা, তাহা দ্বারা কোনও দিন কোনও দেশের, দশের, জাতীয় জীবনের কিংবা সমাজের-উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে না। অসত্যের উপর কখনও একটা অভ্রভেদী সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন হইতে পারে না—হইলেও অনেকক্ষণ

থাকিতে পারে না। তুষার-স্তূপের ন্যায় বসন্তের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সহসা খসিয়া পড়িবেই পড়িবে; কিছুতেই থাকিবে না, কোনও দোহাই খাটিবে না, কোনও যুক্তি আঁটিবে না। যাইবেই।

তবে হয় কি? হইতেছে কি? আর কিই বা হইতে পারিবে? হয় পাপ। হইতেছে সর্ব্বপ্রকারে আমাদের অধঃপতন। আর হইবে চিরদিন পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে! পাপপ্রথার পাপফলে দিন দিনই আমাদের দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার অবনতি সংসাধিত হইতেছে, আমাদের দৈহিক আকার প্রতি পুরুষেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। আমরা ক্রমে ক্রমেই হীনবল ও হীনতেজ হইয়া পড়িতেছি। প্রতিদিনই আমাদের শৌর্য্যবীর্য্য কমিয়া যাইতেছে, দিন দিনই আমরা নিঃসাহস ও নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছি। এখন আর আমাদের সে দেহ নাই, সে দৈহিক ক্ষমতা নাই, সে সাহস নাই, সে তেজ নাই, সুতরাং তেজোগর্ব্বময় কাজের সে স্পৃহাও আজ আর আমাদের অন্তরে উদিত হইতে পারে না। আজ আর আমাদের মানুষের মত কিছুই নাই। সব গিয়াছে, সব হারাইয়াছি! সব ফুরাইয়াছে! আত্মবিশ্বাস—আত্ম-নির্ভর—আত্মমর্য্যাদা এগুলি আজ আমাদের নিকট কেবল কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উচ্চ আশা কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা করা আজ যেন আমাদের পক্ষে আকাশ-কুসুমের মত হইয়া পড়িয়াছে! এক কথায় আজ মানুষের মত আর আমাদের কিছুই নাই। সব গিয়াছে—সব হারাইয়াছি! সব ফুরাইয়াছে!

তবে আছে কি? আছে পর-পদলেহনবৃত্তি! আছে কেবল

চাকুরী করিবার স্পৃহা। আর আছে আত্ম-অবিশ্বাস ও আর্ত্তনাদ! চোকের জল আর মুখের কথা! কি অধঃপতন! কি দুঃখ! কি পরিতাপ! আমরা মানুষ? আর বেঁচে আছি?

কিন্তু কি হইবে? কত দিন আর আমরা এমনভাবে থাকিব? এমনই ভাবে কি চিরদিন চলিয়া যাইবে? দিন দিন কত অযথা অন্যায় অত্যাচার অবিচার হইয়া আসিতেছে, কত জন মিছামিছি কতরূপে নির্য্যাতন ভোগ করিয়া আসিতেছে, প্রতিনিয়ত কত প্রাণিহত্যা, কত ভ্রূণহত্যা হইতেছে, কত পাপ হইতেছে, পাপ-প্রস্রবণ দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে, প্রতিদিনই প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। আর আমরা? আমরা সেই পাপ-প্রস্রবণের প্রবল স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অবিরামগতিতে নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ অতর্কিতভাবে ভাসিয়া চলিয়াছি; শুধু আমি নই, তুমি নও, রাম নয়, শ্যাম নয়,—সকলেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সকলেই নির্ব্বাক্, নিশ্চেষ্ট—নিস্তব্ধ! সকলেই কাঠের পুতুল। ছি! ধিক্ আমাদের, আমরা আবার মানুষ! আমাদের আবার মনুষ্যাধিকারের দাবী! আমাদের আবার স্বরাজপ্রাপ্তির চেষ্টা! আমাদের আবার স্বাধীনতা লাভের চিন্তা! আমাদের ভিতর কি এমন কেউ নাই, যে নাকি এই ধর্ম্মের নামে এই সমুদয় সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে? এতগুলির মধ্যে আমরা কি সবই ভেড়ী, বক্রী, ছাগল? একটীও কি মানুষ নয়? কেউ কি এ সব অত্যাচার, অবিচার এবং অসত্য অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে না? কাহারো কি সে সাহস

নাই? হায়, সত্য কি এতই সঙ্কীর্ণ! সত্যের মর্য্যাদা কি এতই কম? অসত্য কি এতই প্রবল? অসত্যের প্রভাব কি এতই বেশী!

হিন্দুরা 'অখাদ্য' খাওয়ার ভয়ে, এমন কি, বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্যও বিদেশে যাইতে অক্ষম। কিন্তু ঘরে বসিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া স্বগৃহে সস্ত্রীক কত জন কতরূপ "অখাদ্য"কে সুখাদ্য করিয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়তে পরিণত করিয়া আহার করিতেছেন, তাহাতে দোষ নাই, সমাজ তাহা জানিয়াও জানে না। হিন্দু-বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ-প্রথা এদেশে প্রচলিত নাই, সুতরাং হিন্দু-বিধবাগণ দ্বিতীয় বিবাহ করিতে অক্ষম। বিধবারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইবে; সমাজ তাহা দেখিতে সহিতে কিংবা বহিতে পারিবে না; কিন্তু অবৈধরূপে দুই, তিন, চারি কেন ততোধিক বার বিবাহে তাহাদের অধিকার আছে; অবৈধরূপে সঙ্গমে তাহাদের স্বাধীনতা আছে, অনেকেই তাহা করে। সমাজ তাহা দেখিতে, সহিতে এবং বহিতে পারে; ইহাতে বৎসর বৎসর কত প্রাণিহত্যা ও ভ্রূণহত্যা হইতেছে, সমাজ তাহা অকাতরে দেখিতেছে, সহিতেছে, বিনাবাক্যব্যয়ে সে পাপের বোঝা বহিতেছে। কোনও আপত্তি নাই! কোনও কথা নাই!

ইহার অর্থ কি? খাওয়ায় দোষ নাই, বলায় দোষ! ক্রিয়া-সম্পাদনে পাপ নাই, স্বীকার উক্তিতে পাপ! এই সকলের মানে কি? এরূপ বিচারের অর্থ কি? ইহা হইতে আমরা কি বুঝিব? বুঝিব—এসব যেমনই অপ্রাকৃতিক, তেমনই অসত্য। তাই আজ

ইহার ক্রিয়া নাই, কল্পনামাত্র বর্ত্তমান; কর্ম্ম নাই, কিন্তু পুরাতন কর্ম্মসূত্র মাত্র আছে, বন্ধন আছে আবদ্ধ নাই। কারণ? ইহা অসত্য। কেননা, যদি ইহা প্রকৃত কি সত্য হইত, তবে, কিঞ্চিৎ বেশী কিংবা কম হউক, এই প্রথা সমুদয় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কিয়ৎ-পরিমাণে, অন্ততঃ বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু কই? কোথাও ত এই সমুদয়ের এইরূপ অভিনয় দৃষ্ট হয় না? কোন স্থানে—কোনও দেশেও ত মানুষে মানুষকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় না, এক মানুষে আর এক মানুষের স্পৃষ্ট দ্রব্য থাইলে জাত যায় না? কোনও দেশে তো মানুষে যাহা থায় তাহা "অথাদ্য" বলিয়া বিবেচনা করে না? কোনও সমাজেও ত স্ত্রীলোকেরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হয় না, সমাজ ত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না? যাহা কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, যে সমুদয় কোনস্থানে দেখা যায় না, তবে কিরূপে সে সবকে প্রকৃত কিংবা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? তবে কিরূপে সে সমুদয়কে সত্য বলিয়া মানিয়া লইব কিংবা ধরিয়া লইব? কিরূপে লইব? কেন লইব? কেন ইহাকে সত্য বলিব? কেন অসত্য অপ্রকৃতকে, প্রকৃত বা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? কিরূপে পারিব?

পারি না—পারিব না—পারা উচিত না। এ সব প্রথার প্রবর্ত্তন কেবল সাময়িক মাত্র। যে সময় এই সমুদয় প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল যথন ইহা সম্ভবতঃ উপকার করিয়াছিল, সে সময় গিয়াছে। ইহার ক্রিয়াও চলিয়া গিয়াছে। যাক্—ইহার আর দরকার নাই; সুতরাং জোর করিয়া ধরিয়া রাখা নিতান্ত অনাবশ্যক ও অন্যায়।

এখন কথা এই—যদি আমরা আমাদের সামাজিক মঙ্গল কিংবা সামাজিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করি, তবে এই গতপ্রায় প্রথা সমুদয়কে জোর করিয়া ধরিয়া রাখা উচিত নয়। কেন না, যদি সমাজ সংস্কার করিতে হয়, যদি সমাজকে উন্নত করিতে হয়, তবে আমাদের ছাড়া ভিন্ন দেশের ভিন্ন সমাজের রীতিনীতিগুলি দেখিয়া শুনিয়া তারপর বিশেষ বিবেচনা করিয়া যদি একটুও সম্ভব হয়, নূতনের প্রবর্ত্তন, কিংবা পরিবর্ত্তন, যাহা দরকার বোধ হয়, তাহা করিতে হইবে। আর তাহা করিতে হইলেই বিদেশে যাইতে হইবে, বিদেশীদের সঙ্গে মিশিতে হইবে, খাওয়া দাওয়া করিতে হইবে। কিন্তু এ সব করিতে যদি সমাজচ্যুত হইতে হয়, কিংবা আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে কে যাইবে? আর যদি বা কেহ নিজের চেষ্টায় এইরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া স্বদেশ-প্রত্যাগত হইল, সমাজ যদি তাহাকেই আপনার গণ্ডি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, তবে সমাজই বা কিরূপে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে? শিক্ষিতেরাই সমাজের উন্নতিসাধন করিবে—তাহারাই চিরদিনই করিয়া থাকে। কেন না, তাহারাই সক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও বলা হইতেছে না যে, সব বিলাতী শিক্ষিতেরাই কেবল সংস্কারের কার্য্য সম্পন্ন করিবে। না, তাহা নহে। আমাদের এ দেশ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী কিংবা আমেরিকা নহে; কাজে কাজেই ষোল আনা সাহেবী সভ্যতা আমাদের দেশে কিংবা সমাজে থাপ খাইবে না। এক কথায় আমরা সাহেব হইতে পারিব না। কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্যকে পাশ্চাত্য বলিয়াই পরিত্যাগ

করিতে পারি না। আর প্রাচ্যকেও প্রাচ্য বলিয়াই পরিবর্জ্জন করিতে পারি না। চাই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সংমিলন। প্রাচ্যের যাহা সংরক্ষণীয় তাহা অবশ্য সম্মানের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। আর পাশ্চাত্যের যাহা পরিগ্রহণীয় তাহা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সংমিলিত হইয়া সমালোচনাপূর্ব্বক যাহা ভাল হয় স্থির করুন, ইহাই বক্তব্য। কারণ, তাঁহাদেরই ভালমন্দ, সদসৎ, ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। সমাজের হিতাহিতের বিষয় চিন্তা করিবার ক্ষমতা তাঁহাদেরই সাধারণতঃ বেশী থাকে। সুতরাং ইহা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এ দেশের তুলনা কেবল এ দেশেরই সঙ্গে খাটে; এ দেশের উন্নতি করিতে হইলে, এ দেশের মঙ্গল দেখিতে হইলে, এ দেশী দৃষ্টান্ত এবং যতটা সম্ভব এ দেশী শিক্ষাই প্রকৃত পক্ষে কার্য্যকরী হইবে।

আর সত্যই সমাজের ভিত্তি হওয়া উচিত, কেন না, অসত্যের উপর এত বড় বিরাট্ ব্যাপার দাঁড়াইতে পারে না; কারণ অসত্য অস্থায়ী আর সত্য স্থায়ী। সুতরাং সত্যই সমাজের ভিত্তি হওয়া উচিত। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই তাই। কারণ, তাহা না হইলে, সর্ব্ব প্রকার উন্নতিই একরূপ অসম্ভব। কেবল এ দেশেই আজ কালও এই প্রকার। কিন্তু চিরদিনই যদি অসত্য এইরূপ অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে, চিরকালই যদি যাহারা শিক্ষিত, উন্নত, এবং অভিজ্ঞ তাহারা সমাজ হইতে বিতাড়িত হইতে থাকে,

তবে এ সমাজ কিরূপেই বা উন্নতি লাভ করিবে? কিরূপেই বা এ দেশে উন্নতিশিখরে আরোহণ করিবে? কি উত্তর?

পণপ্রথা।

একটী নূতন কথা। কথাটী বাস্তবিক পক্ষে নূতন নহে, কিন্তু আমার নিকট বোধ হইল, সেইরূপ। কেন না, ব্যাপারটী মাত্রার উপর কিংবা তারও উপরে উঠিয়াছে, কাজেকাজেই নূতন এবং আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল।

আমাদের গ্রামে একটী (কায়স্থ) ভদ্রলোকের মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ। বংশটী ভাল, মেয়েটীও দেখিতে বেশ সুশ্রী। বয়স—জোর, বার কিংবা তের বৎসর। ৮।১০ মাইল দূরাস্থিত অন্য একটী গ্রামের বংশমর্য্যাদায় সমকক্ষ একটী ভদ্রলোকের ছেলের সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত। পাত্রেরা তিন ভাই। পৈতৃক সম্পত্তি এক থাদা জমি ও বাড়ী। পাত্র জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ তাহা জানি না, বলিতে পারি না। আর লেখাপড়ায় কতদূর কি তাহাও অবগত নহি; অবগত হইবার সুবিধাও তেমন ছিল না। কেন না, পাত্র কর্ম্ম করে, তিনি একজন উকিলের মুহুরী। পাত্রপক্ষ ইতিমধ্যে এখানে আসিয়াছিলেন এবং বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথা উথাপনও করিলেন। পাত্রপক্ষ নগদ ৫০০৲ শত টাকা যৌতুকস্বরূপ হাঁকিয়া বসিলেন; শুদ্ধ তাই নহে, এতদ্বাদে দুর্ব্যয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিতে বলিলেন। তৎপর কন্যার জন্যও এক প্রস্থ সোণার গহনার দাবী করিতে ভুলিয়া যান নাই। কিন্তু কন্যার মাতা বুদ্ধিমতী।

তিনি বুঝিলেন, ৫০০৲ টাকা দিতে অসম্মত হইলেন। পাত্রপক্ষ অগত্যা নাচার হইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ৫০০৲ টাকার হাঁক্ রাখিয়া গেলেন। কথাটা আমাদের কাণে বাজিতে লাগিল, চারি আনার উকীলের মোহরারের হাঁক্ ৫০০৲ টাকা, কথাটা একটু আশ্চর্য্য নয় কি? উকিলের মোহরারের হাঁক্ ৫০০৲ টাকা! হিন্দুসমাজে হ'ল কি?

যাই হ'ক, এই জন্য আজ কাল কন্যাসন্তান জন্মিলেই পিতার বদনমণ্ডলে কালছায়া পড়ে, শুধু কন্যা বড় হইলে পরের ঘরে যাইবে বলিয়াই নয়। কিন্তু কথাটা যে বড়ই গুরুতর। কিন্তু কন্যা না হইয়া যদি কেবলই পুত্র হয়, তবে অল্পকাল মধ্যেই যে কন্যাদায় কথাটা উঠিয়া যাইয়া পুত্রদায় কথাটার প্রচলন আরম্ভ হইবে! এবং আর কিছুকাল পরে প্রসূতির অভাব পরিদৃশ্যমান হইবে। বেশী কথায় কাজ কি, এক কথায়—পৃথিবী তাহা হইলে অচিরেই মনুষ্যশূন্য হইতে বসিবে! না হইলে ভগবানকে সৃষ্টি-কৌশল অন্যরূপ করিতে হইবে। বুঝি বা শেষে পুরুষকে প্রসূতি সাজিতে হয়, অথবা গাছে মানুষ ফলাইতে হয়! কিংবা আর কিছু! আর তাহা না হইলে কন্যাকর্ত্তাদের কন্যার জন্মে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। তৎপরিবর্ত্তে কন্যা বড় হইলে পুত্রবৎ তাহাকেও শিক্ষিত করা উচিত, তাহা হইলেই কন্যা জন্মার জন্য দুঃখিত হইতে হইবে না। যদি শিক্ষিতা এবং ক্ষমতাশালিনী হয়, তবে আর তাহাদের জন্যও ভাবিতে হয় না। তাহারাও আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তাহাদের বিবাহের জন্যও আর ভাবিতে হইবে না।

এবং এমন কি পুত্রের ন্যায় তাহারাও তাঁহাদের সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে এবং তাহা হইলেই পিতার কন্যাসন্তানের জন্ম হেতু সন্তপ্ত কিংবা অনুতপ্ত হইতে হইবে না। এ বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। আজ কাল তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত বোধ করিয়াছেন এবং কার্য্যেও সেই প্রকারই পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এখন ঈশ্বর করুন এইরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইরূপ দৃষ্টান্ত যত শীঘ্র যত বেশী সম্ভব জনসাধারণের সম্মুখে ধারণ করুন, সমাজের পাপ প্রথাগুলির আস্তে আস্তে অবসান হউক। আর কন্যার জন্মে কন্যার পিতার মুখে হাসি ফুটুক। পুত্রের ন্যায় কন্যার জন্মেও লোকে আনন্দানুভব করিতে সক্ষম হউক, ইহাই একমাত্র বিনীত প্রার্থনা।

বিবাহ কি বিধির বিধান ? না মানবের জ্ঞানপ্রসূত ?

স্ত্রী-পুরুষ একে অন্যের অংশ। এক ছাড়া অপর অসম্পূর্ণ, একের অভাবে অপরটী নিষ্প্রভ, নির্জীব—সন্ন্যাসী। একাকী স্ত্রী কিংবা পুরুষ সন্তান উৎপাদন করিতে অক্ষম; সুতরাং এই সৃষ্টিও অসম্ভব। কেন না, পুরুষ এবং প্রকৃতি একে অন্যের সহিত সংমিলনে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহা হইলেই সন্তান উৎপাদন সম্ভব হয়, এবং তাই এই বিপুল সৃষ্টির সৃষ্টি। ইহাই সৃষ্টির সত্য,

সৃষ্টির তত্ত্ব এবং সৃষ্টির মূল। এই রূপেই এই এতবড় বিশ্বসংসার—সৃষ্টির, সম্ভব হইয়াছে। পুরুষ এবং প্রকৃতি সমভাবে সমান অংশে এই বিপুল বিশাল সৃষ্টির সম্ভব করিয়াছে, দু'জনেই তুল্যাংশে ইহার সৃষ্টির অধিকারী ও অধিকারিণী। কাহারো কম নয়, কেহই কম নয়, কাহারো কর্ম্ম হেয় বা অবজ্ঞেয় নয়। দু'য়েই সমান, দু'য়েই প্রধান, দু'য়েই স্বাধীন, কিন্তু দু'য়েই অধীন।

কিন্তু এই যে পুরুষ এবং প্রকৃতির সৃষ্টি—এই যে পুরুষকে পুরুষ এবং প্রকৃতিকে প্রকৃতি করিয়া গঠন করা, ইহা নিশ্চয়ই ভগবান্ অথবা কোনও অপরিচিত—অজ্ঞাত কিন্তু অপরিসীম মহান্ হস্ত-সম্পাদিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই যে একে অন্যের অংশ, একে অন্যের অধীন বা অসম্পূর্ণ অর্দ্ধেক, ইহা ভগবানের বিধান, মনুষ্যের নহে। এই অতি আশ্চর্য্য অসম্পূর্ণ অর্দ্ধেকের সৃষ্টি ভগবানের, মানুষের নহে। বল তোমার যাহা খুসি, যাহা রুচি, যাহা বিশ্বাস, এবং যাহা ইচ্ছা, কিন্তু আমি বলিব—সেই অসীম, অনন্ত অব্যক্ত শক্তির সৃষ্টি। তোমার যাহা অভিরুচি বলিতে পার, কিন্তু আমি বলিব—ভগবান্ পরমেশ! আর যাহা খুসি ব'লে ডাক, আমি ডাকিব মা। পুরুষ এবং প্রকৃতি ভগবানের সৃজিত। আপনি তিনি পুরুষ এবং প্রকৃতি রূপে বিভক্ত হইয়া বসিয়া আছেন, অথবা আপনি তিনি পুরুষ এবং প্রকৃতি রূপে জগতের সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান। তিনিই এই অনন্ত সৃষ্টি অথবা এই অনন্ত সৃষ্টির তিনিই স্রষ্টা। তাঁরই তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। তাঁরই সকল—তিনিই সব। তাঁরই এ বিশ্বমূর্ত্তি, তিনিই এই বিশ্বভক্ত

পুরুষ প্রকৃতি রূপে বিরাজমান—পরিদৃশ্যমান। এ বিশ্বে—এ অনন্তজীবে পুরুষ প্রকৃতি রূপে তিনি। আর পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্মিলন তাঁহারই প্রাকৃতিক বিধান, তাঁহারই অনন্ত লীলা। এবং তাহা হইতে পুনরায় উৎপত্তি। এ সবই তাঁহার ইচ্ছা।

কিন্তু মানব-সমাজে এই বিবাহ-প্রথা—কাহার সৃষ্টি? এ কি ভগবানের বিধান? না, এটা মানুষের জ্ঞানপ্রসূত? ইহা কি ভগবানের সৃষ্টি? না, মানুষ আপনার চিন্তার প্রভাবে এই প্রথার অভাব অনুভব করিয়া আপনারাই ইহার প্রচলন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমানে আলোচ্য এবং বিবেচ্য।

আমরা দেখিতে পাই, এই বিবাহ-প্রথা এক মনুষ্য-সমাজেই বর্ত্তমান। মনুষ্য ভিন্ন, অন্য কোনও ইতর জীবের ভিতর এই প্রথার প্রবর্ত্তন কিংবা প্রচলন নাই। পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্মিলন দুই অসম্পূর্ণের মিলন,—ইহা সর্ব্ব জীবে—সর্ব্বত্র—সকল সমাজেই পরিদৃশ্যমান। সকল জীব জন্তুর মধ্যেই পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গমক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু বিবাহের মতন এমন বাঁধাবাঁধি কোনও কিছুই আছে বলিয়া অনুমানও করা যায় না। অন্য সমুদয় ইতর প্রাণীদের মধ্যে কোনও কোন প্রাণীরা কেবল মাত্র একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এক সঙ্গে বাস করে এবং সময় চলিয়া গেলেই তাহাদের মধ্যে আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না। তাহাদের সম্পর্ক কেবল সাময়িক সম্পর্ক। আর কতকগুলি আছে যাহাদের সম্পর্ক যখন তখন। আবার আর কতকগুলি আছে, যাহারা আজীবন একসঙ্গে বাস করে, কিন্তু একের অভাবে অন্যে অন্য সঙ্গ খুঁজিয়া

লয়, এবং আবার পূর্ব্ববৎ জীবন যাপন করিতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই সমুদয় প্রাণীদিগের সন্তানসমুদয় আহার্য্য আহরণ করিতে শিখিলেই আর তাহাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকে না। যাই হ'ক, মোটের উপর কথা এই যে, ইহাদের কাহারও বিবাহ বলিয়া কিছু নাই, বিবাহ কেবল এক মনুষ্যসমাজেই প্রবর্ত্তিত এবং প্রচলিত। ইহা মানুষের মধ্যে আছে,—আর কোথায়ও নাই। মিলন, সকল জীব জন্তুর মধ্যেই আছে, কিন্তু এমন রকমের মিলন, এরূপ চিরদিনের মত মিলন, মানুষ ছাড়া আর কাহারও মধ্যে নাই। মিলন সকলের, কিন্তু বিবাহ মানুষের। মিলন প্রাকৃতিক, বিবাহ মানবিক। মিলন প্রাকৃতিক নিয়মানুগত, বিবাহ মানবের জ্ঞান-প্রসূত। মিলন ভগবানের বিধি, বিবাহ মানুষের সৃষ্টি। ভগবানের সর্ব্বত্র সমান বিধান, মানুষ মনস্-শক্তির জোরে স্বতন্ত্র—প্রধান। বিবাহপ্রথা মানবের আপনার কৃত। ইহা মানুষের নিজস্ব—আপনার।

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কি ?

কিন্তু চিন্তাশক্তিশীল মানুষ কেন এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিল ? ইহাদ্বারা কি সমাজের ইষ্ট না অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে ? এই প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন কি ? কিসে মনুষ্যগণ ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে লাগিল বা বাধ্য হইল ? মানুষ কি ইচ্ছা করিয়া এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছে, না, প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া ইহার সৃষ্টি করিয়াছে ? বর্ত্তমানে তাহাই ভাব্য এবং বক্তব্য।

বিবাহিত জীবনে মানুষের সুখ যেমন, দুঃখও তদধিক, অধিকাংশ

লোকের মুখেই এইরূপ শুনা যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুঃখ অধিক হ'ক আর না হ'ক, সুখ আর দুঃখ যে মানব-জীবনে সমান ভাবে ভোগ্য, তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই—সুখ দুঃখ যদি তুল্যাংশেই ভোগ্য, তবে লোকে বিবাহে দুঃখের বিভীষিকা না দেখিয়া কেবল সুখের স্বপন দেখে কেন? যদি বিবাহিত জীবনে সুখ দুঃখ সমান ভাবেই ভোগ করিতে হইবে, তবে লোকে কেবল সুখের আশাই করে কেন? কেন লোকে দুঃখের কথা একটিবারও ভাবে না? কেন লোকে বিবাহটা কি তাহা বিশেষ করিয়া ভাবে না, ভাল করিয়া তলাইয়া দেখে না? আর যেমন সুখের আশায় অগ্রসর হয়, তেমনি কেন দুঃখের ভয়ে ভীত হইয়া বিবাহে বিরতহয় না? কেন বিবাহ হয়? বিবাহে যদি এত দুঃখ, তবে কেন লোক বিবাহ করে? কেন বিয়ের জন্য পাগল হয়? আর এত কষ্ট যদি, তবে লোকে স্ত্রী-বিয়োগে গৃহ-শূন্য, সংসার-শূন্য, এমন কি বিশ্ব-শূন্য অনুভব করে কেন? স্ত্রী কি? বিয়ে কি? কেন করে?

কেন করে? মানুষ ইচ্ছা করিয়া করে না। ইচ্ছা করিয়া মানুষ কখনও মানুষের কথা কিংবা প্রথা মানিতে চায় না—মানে না। কিন্তু বিধির বিধান মানে—মানিতে বাধ্য। মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে পারে না, তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা করিতে সক্ষম নহে। তাঁহার প্রাকৃতিক গতিকে বাঁধা দিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। দিলে তাহার কুফল ভোগ করিতে হয়, মানুষ ইহা বিশেষ রূপে অবগত আছে।

পুরুষ আর প্রকৃতির সংমিলন ইহা প্রাকৃতিক,—ভগবানের বিধান। মানুষ তাঁহার অন্যথা করিতে পারে না। মানুষ প্রাকৃতিক জীব, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে খুব কমই সক্ষম। প্রাকৃতিক মানুষ প্রাকৃতিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে বাধ্য। পুরুষ এবং প্রকৃতির সংমিলন বা সঙ্গম ইহাও প্রাকৃতিক, মানুষ তাহাতে অবাধ্য হইতে পারে না। এ সব ভগবানের অনুজ্ঞা, মানুষ তাহা অবহেলা করিতে অক্ষম। সুতরাং কাঠের পুতুলের ন্যায় তাঁরই আদেশ পালন করে। কিন্তু মানুষ মানুষের কৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় কেন? এ বন্ধন দুঃখময় জানিয়াও কেন ইহা—মানব-সৃষ্ট এ বন্ধন লোকে গ্রহণ করে? কেন লোকে বিয়ে করে? কেন দুঃখের ফাঁসী গলায় পরে? কি সুখ?

বিবাহ মানব-সৃষ্ট হইলেও ইহা যেন ভগবানের অনুমোদিত। কেন না, ইহা ভগবানের বিধানকেও আরও সুবিধান এবং সুশৃঙ্খলায় আনয়ন করিয়াছে। কারণ, পুরুষ এবং প্রকৃতির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ ও সংমিলন বা সঙ্গম, আর তাহা হইতে সন্তান উৎপাদন, এ সবই প্রাকৃতিক। আর এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের সুপরিসমাপ্তির জন্য মানুষ বিবাহপ্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। বিবাহ প্রাকৃতিক বিধানের সুপরিসমাপ্তি করিয়াছে। ধন্য মানব! আর ধন্য তোমার ধী-শক্তি! আর তোমার কর্ম্মে ধন্য তোমার স্রষ্টা! তোমার কার্য্যে আজ তোমার স্রষ্টা আরও গৌরবান্বিত। তাই বলি মানব, ধন্য তুমি, আর ধন্য তোমার স্রষ্টা!

মনুষ্য ভিন্ন আর প্রায় সকল প্রাণীরই সংমিলন বা সঙ্গমের কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। বৎসরের যে কোনও সময়—যে কোনও মাস কিংবা দিনে সঙ্গমবাসনা বলবতী হইতে পারে। কিন্তু যখনই তাহাদের সেই কাল উপস্থিত হয়, সংমিলন বা সঙ্গমে তখনই তাহারা গর্ভধারণ করিয়া থাকে এবং যথাসময় সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু গর্ভধারণ করিয়া গর্ভধারিণী মানুষের ন্যায় ক্রমে এমন দুর্ব্বল বা অচলপ্রায় হয় না, প্রসবের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্তও যথারীতি আহার সংগ্রহ এবং বিচরণ করিয়া বেড়াইতে সক্ষম থাকে। আর সন্তান প্রসবের পরেও মানুষের ন্যায় তেমন অচল অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়া যায় না; ঘুরিবার ফিরিবার, আহার্য্য প্রভৃতি আহরণ করিবার ক্ষমতা তখনও যথেষ্ট থাকে, এবং অনায়াসে করে। যদিও অনেক সময় পুরুষ প্রকৃতির জন্য এ সমুদয় বহন করে। আর নবপ্রসূত সন্তানগুলিরও সবল এবং সক্ষম হইতে মানুষের মত অত সময় দরকার হয় না, অতি অল্পকাল মধ্যেই আহরণ ও বিচরণক্ষম হইয়া আপনার আহার্য্য আপনি আহরণ করিয়া লইতে সক্ষম হয়। এই সমুদয় প্রাণীদের প্রসূতি কিংবা প্রসূতের কাহারও অক্ষম অবস্থায় অধিক সময় অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না, কাজেকাজেই অন্যের অধীনও থাকিতে হয় না। কারণ, দরকার হয় না। সুতরাং তাহারা সব সময় স্বাধীনভাবে আহার, বিহার এবং বিচরণ করিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু মানুষের সে স্বাধীনতা কোথায়? তাহাদের সংমিলন বা সঙ্গমে স্বাধীনতা থাকিতে পারে, কিন্তু তার পর? গর্ভিণী গর্ভধারণ করার পর দিন দিন যখন ক্রমে দুর্ব্বল এবং তার পর

প্রায় অচল হইয়া পড়িবেন, এমন কি জলবিন্দু উঠাইয়া গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তখন কিরূপে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবেন, তখন কিরূপে আপন আহার্য্য সংগ্রহ ও গ্রহণ করিতে পারিবেন? যখন এপাশ ওপাশ ফিরিতে সঙ্কট মনে হইবে তখন কিরূপে তিনি আপনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন? তারপর—প্রসব! আঃ কি ভয়ানক! কি ভীষণ! অবশেষে 'সেই অবস্থায়' সে নবপ্রসূত সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কিরূপে আপনার আহার্য্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন? আর কিরূপে কি দিয়ে সন্তানকে বর্দ্ধিত, শিক্ষিত বা দীক্ষিত করিবে? কিরূপে,—মানুষী, কিসে—কোথায় তোমার স্বাধীনতা? আর—কে তোমার সন্তানের পিতা? মানুষ কিসে? কেন মানুষ বলে? যদি পিতার পরিচয় না হইল, যদি সুশৃঙ্খলা না রহিল, যদি কে কাহার পিতা, কে কা'র পুত্র ইহাই ঠিক না রহিল, তবে আর মানুষ কি? মানুষ কিসে? মানুষ আর ইতর জীবে কি তফাৎ? তবে মানুষকে কেন মানুষ বলিব? মানুষ কাহাকে বলে—? তাই—সেইজন্যই মানুষে বিবাহ-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। মানুষ মানুষোচিত কার্য্য করিয়া, মনুষ্য নামের স্বার্থকতা দেখাইয়াছে, এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির গৌরব বাড়াইয়াছে। ধন্য মানুষ! আর তার ধীশক্তি!

বিবাহ লৌকিক বা সামাজিক বন্ধন। সামাজিক সুশৃঙ্খলার জন্যই সভ্যসমাজ এই বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। একবার ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, যদি মানুষ এই বন্ধনের ব্যবস্থা না করিত, তবে

সমাজ আজ কিরূপ ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক বা বিভীষিকাময় স্থান হইত। এমন কি, সমাজ বলিয়াই কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। সর্ব্বত্র অসভ্যতা এবং অরাজকতার অভিনয় দৃষ্ট হইত। সংসার, সমাজ, স্বজাতীয়তা, কিংবা স্বতন্ত্রতা, এসব কোনও কিছুই সম্ভব হইত না। এক কথায়, আজ এই সভ্য-জগতে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, এসব কিছুই সম্ভব হইতে পারিত না। আমরাও সাধারণ জীবজন্তুর ন্যায়ই জীবন যাপন করিতাম। কিন্তু এক বিবাহই সমস্ত উল্টাইয়া দিয়াছে। বিবাহই মানুষকে সাধারণ জন্তু হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে, মানুষকে মানুষ করিয়াছে, বিবাহই মানুষকে স্বতন্ত্রতার সংজ্ঞা দিয়াছে, সংসারী করিয়াছে, সামাজিক জীবে পরিণত করিয়াছে এবং স্বজাতীয়তা শিখাইয়াছে, এমন কি এই রাষ্ট্রনীতির মূলেও বিবাহ। বিবাহ কি নয়? বিবাহই সব। তথাপি বিবাহ যে লৌকিক বন্ধন—লৌকিক প্রথা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিবাহ লৌকিক হইলেও প্রাকৃতিকের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যভাবে চলিয়াছে। এমনই ভাবে চলিয়াছে যে, মনে হয়, ইহাও যেন প্রাকৃতিক, এবং ইহার অভাব যেন প্রকৃতিকে অসম্পূর্ণ করিয়া ফেলে। সুতরাং মনে হয়, যেন এই প্রথা—এই বিবাহবিধান অসম্পূর্ণ প্রকৃতির সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। এবং এই জন্যই মনে হয়, ইহা প্রকৃতির উপরেও টেক্কা দিয়াছে। বিবাহ লৌকিক—অপ্রাকৃতিক, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় বাস্তবিক পক্ষে ইহাই প্রকৃতিকে পরিসমাপ্তি প্রদান করিয়াছে। ইহা

অপ্রাকৃত হইলেও প্রকৃতের শিরোভূষণ। ইহা ছাড়া প্রকৃতি অপরিসমাপ্ত—অসম্পূর্ণ!

ভালবাসা কি?

পুরুষ এবং প্রকৃতির সংমিলন, প্রাকৃতিক। কিন্তু প্রণালী কি? কি প্রণালীতে পুরুষ এবং প্রকৃতি সম্মিলিত হয়? আর কেন হয়? কিসে তাহাদিগকে সম্মিলিত করে? এবং যাহার সাহায্যে সম্মিলিত হয় তাহাই বা কি?

ভালবাসাই পুরুষ এবং প্রকৃতিকে সম্মিলিত করে। পুরুষ এবং প্রকৃতি হৃদয়যুগলকে ভালবাসারূপ সেতু সংযোজিত করে, প্রণয় বন্ধনে দুটী প্রাণ আবদ্ধ হইয়া বিবাহাদি লৌকিক এবং সামাজিক ক্রিয়া এবং আচার-ব্যবহারাদি সমাপনান্তে সংসার বা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনার্থে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং যথাসাধ্য তাহাই করিতে থাকে। ক্রমে সন্তানাদি হইতে থাকে, কর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যের মাত্রাও চড়িতে বা বাড়িতে থাকে। মানুষ একটীর পর আর একটী করিয়া কর্ত্তব্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আবার ক্রমে যথাসাধ্য সেইগুলি প্রতি-পালন করিতে থাকে। পুরুষ প্রকৃতি এইরূপেই পরস্পর পর-স্পরের আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া থাকে। প্রীতিই ইহার মূল, প্রীতিই দু'টী প্রাণকে একটী করিয়া ফেলে, প্রীতি পবিত্র সংসারধর্ম্মের প্রধান সূত্র। এই প্রীতিই সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার মূলসূত্র এবং মূলমন্ত্র। এই প্রীতির অভাবে সংসারধর্ম্ম

পালন হয় না; আর এই প্রীতির অভাবই বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসের সূচনা।

কিন্তু এই প্রীতি বা ভালবাসা কি? কাহাকে বলে? একি কোনও জন্তু, বস্তু, না, মন্ত্র বিশেষ? ইহার আকার কিরূপ—ইহা কেমন?

পুরুষ এবং প্রকৃতি হৃদয়কে সম্মিলিত করিতে যে অদৃষ্ট—অবক্তব্য অব্যক্ত কিন্তু অনুভবনীয় শক্তি, দু'টী হৃদয়ের মাঝখানে থাকিয়া ক্রিয়া করিতে থাকে—যে শক্তি দুটী হৃদয়কে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করিয়া লয়, যে শক্তি দুই দেহের দুটী প্রাণকে একটী করিয়া একই উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিয়া দেয়, তাহাই প্রীতি বা ভালবাসা, আর এই আকর্ষণের আকৃতিই রূপ বা সৌন্দর্য্য। ভালবাসা ইহারই সাহায্যেই বা ইহাকে আশ্রয় করিয়াই পুরুষ এবং প্রকৃতিকে সংযোজিত করে। শক্তিই প্রাণ, আর প্রাণেরই প্রকৃতি প্রতিমা। অভ্যন্তরাবদ্ধ প্রাণেরই প্রতিমূর্ত্তি বাহ্যিক দেহ। সুতরাং দৈহিকরূপ আভ্যন্তরীণ গুণনিচয়ের বহির্বিকাশ মাত্র। অসমাপ্ত পুরুষ এবং প্রকৃতি পরস্পর দৃষ্টে স্ব স্ব অসমাপ্ত—অতৃপ্ত গুণসমূহের অভাব অনুভব করে এবং পরিপূরণ বা পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল হয় ও মিলনের জন্য ব্যগ্র হয়, এবং অকালে অবলীলাক্রমে একে অন্যের নিকট সহানুভূতি ও সহায়তা পাইয়া আস্তে আস্তে মিশিতে, মিলিতে, সংযোজিত হইতে এবং অবশেষে আবদ্ধ হইতে থাকে। ইহাই ভালবাসা বা প্রীতিবন্ধন। এই ভালবাসাই বন্ধনের মূল। ইহাই বিবাহের আদি। ইহাই প্রকৃত বিবাহ।

কেন না, ইহাই প্রাকৃতিক। এবং বিবাহ এইরূপে সংঘটিত হইয়া শেষে সামাজিক উপায়ে সম্পন্ন হওয়াই উচিত বলিয়া বোধ হয়, বিশেষ হিন্দুসমাজে যেখানে স্ত্রীর এক ভিন্ন স্বামী গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, সেখানে ইহাই প্রশস্ত বলিয়া ধারণা হয়। পূর্ব্বকালে হিন্দুসমাজে যেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা প্রায় এই রূপই ছিল। পুরাণাদি গ্রন্থসমূহ সেই রূপই প্রমাণ দেয়। এবং বর্ত্তমানেও সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রায় সেইরূপ প্রথাই প্রচলিত, তবে একটু এদিক্ আর ওদিক্।

আমি অবশ্য বলিতেছি না যে, সাহেবী বিবাহপদ্ধতি হিন্দু-সমাজে প্রচলিত হউক। কিন্তু সভ্যসমাজ এবং সুধীবৃন্দকে দেখিতে, বুঝিতে এবং বিবেচনা করিতে বলিতেছি যে, এই প্রকৃত-পদ্ধতির সহিত তুলনায় হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথাকে বিবাহ বিভ্রাট বলা উচিত কি না।

বিভ্রাট কেন বলি ?

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজে যেরূপভাবে বিবাহাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাকে বাল্যবিবাহ না বলিয়া কৈশোর-বিবাহ বলিলেই ভাল হয়। কেন না, বাস্তবিকপক্ষে ইহা বাল্য-বিবাহ নয়। কারণ, ইহা বাল্যকাল অতীত হইয়া কৈশোরেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাকে আর বাল্যবিবাহ বলা যায় না ; ইহা বাল্য বিবাহ নহে, কৈশোর বিবাহ। আর এই বাল্য-বিবাহ পরিশেষে কৈশোর-বিবাহে পরিণত হওয়াতেই বোধ হয় বর্ত্তমানে বিবাহে এত কুফল প্রসব করিতেছে। যে সমুদয় কারণে বাল্যবিবাহ-প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, যে সমুদয় সুখের আশায়, যে সমস্ত বিষয়ের পরিপূর্ণতা এবং সফলতার জন্যে বাল্যবিবাহ-প্রথাকে এত উচ্চস্থান দেওয়া হইত, সে সমস্ত এখন আর হইতে পারিতেছে না। কেন না, বর্ত্তমানে সমাজ-শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষে সেই সমুদয় প্রণালীর প্রবর্ত্তন এবং প্রচলন অসম্ভব। কল্পনাই কেবল কার্য্য করিতে পারে না। কাজেকাজেই বর্ত্তমান সময়ে আর সে সমুদয় সুখ সফলতার আশা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সমাজশাসক-সম্প্রদায় কল্পনা-সূত্রমাত্র ধরিয়া বৃথা টানাটানি করিয়া কেবলই কুকর্ম্মের প্রণয়ন করিতেছেন এবং ফলে বর্ত্তমান হিন্দু-বিবাহ-প্রথা একটা বিভ্রাটের মত কিছু হইয়া পড়িয়াছে।

আজকাল সাধারণতঃ দেখা যায় হিন্দু মেয়েদের বার, তের,

চৌদ্দ কিংবা পনর, ষোল, এমন কি, সতর, আঠার বৎসর বয়সেও বিবাহ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মেয়েদের চরিত্র এই সময়ের মধ্যেই স্ব স্ব মাতা, পিসীমাতা, মাসীমাতা কিংবা যে কোনও অভি-ভাবিকার নিকটে থাকে, তাহার অনুকরণে গঠিত হইয়া থাকে। বার, তের, চৌদ্দ বৎসরে মেয়েদের চরিত্র গঠন হওয়ার বাকী থাকে না। যাহাকে যে ছাঁচে ঢালিবার তাহা এই সময়ের মধ্যেই ঢালা হইয়া যায়। যেরূপ সংসারে যেরূপ অভিভাবিকার হাতে তাহাদের চরিত্র গঠনের ভার ন্যস্ত হইয়া থাকে, তাঁহারই অনুকরণে তাহার চরিত্র গঠন প্রায় শেষ হইয়া যায়। বাকী থাকিলেও সামান্য একটুকু। কিন্তু যাহা একবার হইয়া যায় তাহা আর সহজে ফিরিবার নহে। এই বয়সে বিবাহ হইলে স্বামী যে এই চরিত্র সংশোধন করিয়া আপনার ছাঁচে আপনার ন্যায় আপনার মনের মতন করিয়া এই স্ত্রীর চরিত্র গঠন করিয়া লইবেন, তাহা অসম্ভব না হইলেও ইহা যে নিতান্ত সহজসাধ্য নহে, এ কথা অনেকেরই স্বীকার করিতে হইবে। কঁচি গাছটীকে নোয়ান যেমন সহজ, গাছটী বড় হইলে কি আর তাই? তখন গাছ ভাঙ্গে তবু নোয়ায় না। দুইটি অপরিচিত পরিবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বর্দ্ধিত, গঠিত, শিক্ষিত, এবং দীক্ষিত দুইটী যুবক যুবতীর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সহসা সম্মিলন! কেহই কাহাকে কখনও দেখে নাই, কাহারও কথা কেহ কোনো দিন শুনে নাই, কিংবা কোনো উপায়ে কোন দিন পরস্পর পরস্পরকে জানিবার সুযোগ পায় নাই, অথচ বিধির কোন্ অনিশ্চিত বিধানে, অথবা কোন্ বিপাকে কিংবা সুপাকে পড়িয়া

তাহারা এমন সম্বন্ধাবদ্ধ হয়, যে সম্বন্ধ কোন দিন একালে সেকালে এবং বোধ হয়, ইহকাল পরকাল—অনন্ত জীবনে, ভাঙ্গিবার নয় মুছিবার নয়, বা ছিঁড়িবার নয়। যে বন্ধনসূত্র জীবনে, মরণে অবিচ্ছিন্ন! কি আশ্চর্য্য নীতি! কি বিষম বিধান! কি ভয়ঙ্কর নৃশংসতা! কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কাহারও কোন কথাটী বলিবার যো নাই—একবারে মূক! একদম চুপ! কি ভীষণ! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ধন্য হিন্দু তুমি, আর ধন্য তোমার সমাজ-বিধান ও সমাজ-বন্ধন! যদি কাহারও অমনোনীত হয়, অপছন্দ হয়, কিংবা অমিল হয়, হো'ক, কিন্তু আসে যায় না। আবদ্ধ—চিরতরে আবদ্ধ! থাকিতেই হইবে। বাধ্য হইয়া থাকিতে হইবে! সংসারে থাকিয়া সংসার করিতে হইবে! অন্যথা তুষানলে জ্ব'লে আপনা আপনি ছারখার হইতে হইবে। অথবা অন্যথা পরিত্যক্তা, ঘৃণিতা, অপবিত্রা হইয়া কুলের বাহির হইয়া যাইয়া অকুলে কুল দেখিতে হইবে! কি নির্ম্মমতা! কি নির্দ্দয়তা! কি অত্যাচার! কি অবিচারও কি ভয়ানক! কি নৃশংসতা! কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! এবং আরও আশ্চর্য্যের কারণ এই যে, এই নৃশংসতা,—অত্যাচার আজ এই বর্ত্তমান যুগেও এই হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান! এই বর্ত্তমান সভ্যজগতেও এইরূপ প্রথা প্রবহমান! ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? ইহা ছাড়া আশ্চর্য্য কাহাকে বলিব? আশ্চর্য্য তবে কাহাকে বলে?

কিন্তু তাই বলিয়া আমি সকলকে সাহেবী court-shipর অনুকরণ করিতে বলিতেছি না। সাহেবী সভ্যতার আর দরকার

নাই; এই সমাজে ইহার এই যথেষ্ট, আর প্রবেশ করাইতে বলি না। এ বিষয়ে যতটা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। তবে বলিতে চাই কি? যতটা পার ন্যায়ের শরণাগত হও, প্রাকৃতিক পথ অবলম্বন কর। আর্য্যঋষিদের কৃত শাস্ত্র শুদ্ধ আওড়াইবার জন্য, কেবলই মুখস্থ করিও না; পড়ার মত পড়, তাঁহাদের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে চেষ্টা কর, তাহাতে কি অভিপ্রায় লুপ্ত রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা কর এবং অবশেষে তাঁহাদের সেই আদেশ এবং উপদেশ অনুযায়ী চলিতে থাক। প্রকৃতির প্রতিকূলে যাইও না। অনুকূলে থাকিয়া যতটা সম্ভব মনুষ্যত্বের পরিচয় দাও। প্রকৃতির প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া কে কবে জয়ী হইতে পারিয়াছে?

সাহেবী বিবাহে সহানুভূতি না থাকার কারণ।

সাহেবীবিবাহে সহানুভূতি না থাকার কারণ অধিক নয়—দুই একটী। দেখা শুনা হউক, কথাবার্ত্তা বল, মতামত, জ্ঞান, গরিমা, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির পরিচয় হউক, মিশে কি না মিশে দেখ। স্ব স্ব মনকে জিজ্ঞাসা কর। এ সবই ভাল কথা। দেখিয়া শুনিয়া, জানিয়া বুঝিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ কর; দোষ নাই, ভাল কথা। কিন্তু হাত ধরাধরি, সান্ধ্য সমীরণ সেবন ইত্যাদি এতটা স্বাধীন হইলে চলিবে কেন? স্বাধীনতাটা মন্দ নয়—ভালই, কিন্তু তাহারও অতিমাত্রা যে অন্যায়ের আহ্বান করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? তা'ই বলি, অত বেশী স্বাধীনতা ভাল নয়। এ সমাজে অত স্বাধীনতা মানাইবে না, ও খাঁটী সাহেবী-

আনায় আমাদের দরকার নাই। কেন মানাইবে না, কেন দরকার নাই বলি, তাহা পরে বলিব। এখানে দরকার নাই-ই যথেষ্ট। যা'ই হো'ক্, তাই বলিয়া আমি ইহাও বলিতেছি না যে, সাহেবী সমাজে সকলেই সচরাচর অন্যায়ের আহ্বান করিয়া থাকে; বরং ইহাই বলা উচিত যে, তাহাদের চরিত্রবল, তাহাদের সত্যবাদিতা, তাহাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সৎসাহস আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহাদের শারীরিক এবং মানসিক শক্তিও আমাদের চেয়ে অনেকাংশে অধিক। সুতরাং এই স্বাধীনতা তাহাদের সয়, ইহা তাহাদের মানায় ও তাহাদের পক্ষে খাটে; কাজেকাজেই তাহাদের সমাজে ইহার অভিনয় শোভা পায়। কিন্তু আমাদের এই অবস্থায়—এইপতিত দশায় উহা সইবে না। ইহাতে স্বাধীনতার কুফল ফলিতে পারে। কাজেকাজেই বলি, সাহেবী বিবাহ প্রকৃতিগত হইলেও আমাদের এই অবস্থায় একেবারে ঐ প্রণালী তেমন অনুকূলের হইবে বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয় কারণ।

সাহেবী বিবাহে আপত্তির আর একটী কারণ হ'লো তাহাদের পরিবর্জ্জন প্রথা। যদি বিবাহে স্বাধীনতা লইলে, তবে আবার পরিবর্জ্জন কেন? স্বাধীনতা লওয়ার উদ্দেশ্যই হইল ভালরূপে দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া লওয়া। তাহারই জন্য স্বাধীনতা। যদি তাহাই ঠিক, আর যদি তাহাই করিলে—যদি ভালরূপ দেখিয়া শুনিয়াই পরস্পর পরস্পরকে স্বামী এবং স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলে,

এক কথায়, যদি নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লইলে, তবে আবার পরিত্যাগ আর পরিবর্ত্তন কেন? তবে কি চিরদিন এই কর্ম্মই করিবে? চিরদিন কেবল নির্ব্বাচন, গ্রহণ, আর পরিবর্জ্জন লইয়াই থাকিবে? যদি তাহাই কর, তবে ঘরকন্না করিবে কোন্ দিন? তবে সংসার বাঁধিবে কোন্ দিন? আর গার্হস্থ্য ধর্ম্মই বা প্রতিপালন করিবে কখন? কিন্তু বুঝিতে পারি না, কেন সাহেবেরা এত করিয়াও পরিত্যাগ পরিবর্জ্জন করিতে পারে না? বর ও কন্যার পরস্পর পরস্পরকে নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও পরিবর্জ্জন এবং পরিবর্ত্তন-প্রণালী কেন আইনানুমোদিত ও প্রচলিত? সাহেবী সামাজিক সভ্যতার এই বিষয়টী আমাদের চক্ষে বড় বেশী বাজে এবং জ্ঞানানুমোদিতও নহে। বুঝিতে পারি না, যদি নির্ব্বাচনেই স্বাধীনতা লওয়া হইল, তবে পরিবর্জ্জন এবং পরিবর্ত্তন প্রথা কেন প্রচলিত থাকিবে? সাহেবদের সভ্যতার এইটুকু আমরা বুঝিতে পারি না, সুতরাং চাইতে পারি না, অতএব বর্ত্তমানে চাই না; কেন চাই না পরে বলিতেছি।

কেন চাই না?

কেন না, দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয়ান সভ্যতায় এইটুকু থাকায় সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ইহা থাকায় বিবাহের বিশেষত্ব বিশেষ কিছু থাকে না। কেন না, বিবাহের উদ্দেশ্য স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিশেষভাবে নির্ণীত করিয়া লওয়া। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, উৎপাদিত সন্তানের

অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা। কারণ, সংসারের উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন। আর সেই সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য আমিত্ব বজায় রাখা। মানুষ জানে তাহাকে মরিতে হইবে; কিন্তু সে তাহা চায় না, কখনও কেহ মরিতে চায় না। মানুষ মরিতে বাধ্য। কিন্তু তবু সে থাকিতে চায়। তাই যে কোনও প্রকারে আমিত্ব রাখিয়া যাইতে চায়। না হইলে আমার যাহা, আমি যাহা করিব, আমি যাহা অর্জ্জন করিব তাহা কে ভোগ করিবে? আমার যে কীর্ত্তিধ্বজা, কার্য্যকলাপ, নাম, যশ এ সব বোঝা কে বহিয়া চলিবে? কে আমার গৌরব গাথা গাহিয়া বেড়াইবে? আর অবশেষে কে আমার কর্ম্মসূত্র টানিয়া চলিবে? তাই মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু হায়, মানুষকে মরিতে হইবে, মানুষ মরিতে বাধ্য।

সন্তান আপনা হইতে উদ্ভূত, তাই সন্তানকে আত্মজ বলিয়া থাকে। সন্তান আপনা হইতে জন্মে—, আপনি মানুষ সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া আমিত্ব বজায় রাখিয়া যায় এবং এই নূতন আমি-কেই আমার ছেলে নাম দিয়া তাহার যাহা কিছু তৎসমুদয় ভোগ দখলের অধিকারী, তাহার কীর্ত্তিধ্বজা, কার্য্যকলাপের বোঝা বহন-কারী, গৌরবগাথা গায়ক, কর্ম্ম-সূত্রের ধারক এবং নাম বহন করিতে নিযুক্ত করিয়া সুখী হয়। "আমিত্ব" বজায়ের পথ এইরূপে পূর্ণভাবে প্রশস্ত করিয়া থাকে। আসল কথা, 'আমিত্ব' বজায় রাখা। কিন্তু এই আমিত্ব বজায় রাখার মূলে 'স্ত্রী'। তাই বলি ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে আমার সংসারে সার বলিয়া আর কিছুই থাকে না। কেন না, প্রকৃতপক্ষে সংসারে সার মাত্র 'স্ত্রী'। স্ত্রীর

অবর্ত্তমানে সংসার সারশূন্য শ্মশান ভিন্ন অন্য কিছু নয় বলিয়া অনুমান হয়। তাহার উপরেই সংসারের স্থায়িত্ব, সারত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীই সংসারের ভিত্তি, স্ত্রীই সংসারের মূল, স্ত্রীই সংসারের সার, স্ত্রীই সংসার, স্ত্রীকেই সংসার বলে। আর সেই যদি আট দিনের মধ্যে দুই বার করিয়া পরিবর্ত্তন হয়, তবে কি প্রকারে সংসার করা সম্ভব হয়? কাহার পক্ষে কি প্রকারে এরূপভাবে সংসার করা সম্ভবপর? কে এমন কর্ম্মকুশল মহাপুরুষ যিনি সপ্তাহে, মাসে কি বৎসরে, দুইবার করিয়া স্ত্রী পরিবর্ত্তন করিয়া এই সংসারে সংসারসংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছেন? কি করিয়া এরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া সংসার সংস্থাপন সম্ভবপর হয়। আমাদের পক্ষে এ কথা বুঝিয়া উঠা মুস্কিল, যদিও বর্ত্তমানে প্রায় সমুদায় ইয়ুরোপীয়ান জগতে অথবা যে কোনও স্থানেই ইয়ুরোপীয়ান সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে, যদিও সমুদয় স্থানেই কিঞ্চিৎ বেশী আর কম, এই প্রথাই প্রচলিতপ্রায়, যদিও সেকালের সেই প্রাচীন রোম এবং গ্রীসেও প্রায় এইরূপই কোনও একটা প্রথার প্রচলন পরিদৃশ্যমান, তথাপি ইহা যে অন্যায়, ইহা হইতে যে বিবাহের উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার দ্বারা যে সামাজিক সুশৃঙ্খলার ব্যাঘাত জন্মিতেছে—আর অবশেষে ইহার দ্বারা যে মানুষের মনুষ্যনামের গৌরব নষ্ট হইতেছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যে অনেকাংশে ভাল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এইটুকু ভাল হইলেও এ ভাল

দ্বারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ তেমন ভাল কিছুই আশা করিতে পারে না। একটু মাজিতে ঘসিতে হইবে, হিন্দু এবং সাহেব এই দু'য়ের মধ্যে যাহা খাটে, যাহা এ দেশী জল বায়ুতে সয়, যাহা এ দেশী লোকের ধাতে সয়, এমন একটা কিছু করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে সমাজ-সংস্কার এখন দরকার। কিন্তু কিরূপ ভাবে কি করিতে হইবে, কি করিলে, কি হইলে সমাজকে কি দিতে পারিলে,—সমাজ কি পাইলে, প্রকৃত পক্ষে স্থায়ীরূপে সমাজের উন্নতি ও উপকার হইতে পারে কিংবা পারিবে, তৎসমুদয় সুধীবৃন্দের বিবেচ্য বিষয়। এ বিষয় তাঁহারা যাহা হয় বিচারও বিবেচনা করিবেন এবং যাহা বক্তব্য, কর্ত্তব্য কিংবা করণীয় তাহা করিবেন। কেন না, ইহা তাঁহাদের কর্ম্ম; সুতরাং তাঁহাদেরই শোভা পায়, অন্যের নয়।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপ্রথা যেরূপ মনে হয়।

আমেরিকার লোকগুলিকে আমার বড় উত্তম লাগে। তাহারা বড় চালাক, চৌকোশ; শুধু তাই নয়, তাহারা কর্ম্মপ্রিয় ও উদ্যমশীল। তাহাদের কথা Go ahead, এবং "Do something new," অগ্রসর হও "নূতন কিছু কর।" কথাটায় কতখানি কি লুকাইয়া আছে, তাহা তাহারা জানে এবং তাই তাহারা Go ahead" মন্ত্রের উপাসনা করে। আর যাহারা দুই এক বার উদ্যমশীল আমেরিকায় যাইবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারাও এই Go ahead Do something new কথাটার মূল্য কতকটা জানে। আমে-

রিকানরা যাহা কিছু করিতে হয়, ইউরোপাদি মহাদেশ ঘুরিয়া তথায় যেরূপ যাহা আছে তাহা দেখিয়া তদুপরি তদপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে—তাহা অপেক্ষাও উন্নত অথচ তাহার চেয়ে সহজ এবং সরল করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। সব বিষয়েই তাহারা এইরূপ। পরিবর্ত্তন কিংবা নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে হইলে এইরূপই চাই, এই-ই দরকার এবং উচিত। নূতন যদি পুরাতন অপেক্ষা উন্নতই না হইল, তবে সে নূতনে দরকার কি? ব্রাহ্ম সমাজ নূতন যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা দেখা যায়, নূতন নয়, অনুকরণ মাত্র। তাহারাও নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা দিয়াছেন, এবং পরিবর্জ্জনও বাহাল রাখিয়াছেন। ও কেবল ইউরোপীয়ান অনুকরণ, নূতন কিছু নয়; ইহাকে নূতন বলা যায় না—এ কেবল অনুকরণ, নূতন করণ নহে, আমেরিকানদের মত ইউরোপীয়ানদের উপর টেক্কা দেওয়া নহে। সুতরাং দেখা যায় ব্রাহ্মসমাজও অভিজ্ঞতার ফলের ভালরূপ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। একটা কিছু করা নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছিল, তাই করিয়াছেন; কিন্তু নূতন কিছু নয়, ইউরোপীয়ান সভ্যতার উপর টেক্কা দেওয়ার মত কিছু নয়। এ হ'ল অনুকরণ, এ'কে বলে অনুকরণ, অগ্রসর নয়। কিছু করা দরকার, করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তেমন কিছু লাভ হয় নাই, কেবল করার জন্যই করা হইয়াছে। আমেরিকানদের মত দেখিয়া শুনিয়া নূতন—টেক্কা দেওয়া কিছু হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ নূতন কিছু করিতে পারেন নাই, অগ্রসর হইতে পারেন নাই, অনুকরণ মাত্র করিয়াছেন।

সমাজের প্রয়োজনীয়তা কি ?

কেবলমাত্র কয়েকজন গৃহত্যাগী সাধুসন্ন্যাসী, যাঁহারা ঈশ্বর আরাধনার জন্য গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও কাজেকাজেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জীবন অরণ্যে বাস করা সঙ্কল্প করিয়া বনে গমন করেন এবং তথায় বাস্তবিকই চিরদিনই যাপন করেন, তাঁহারা ব্যতীত প্রায় সমুদয় লোকই সমাজভুক্ত হইয়া লোকালয়ে বাস করে এবং সমাজ গঠন করিয়া সমাজে বাস করে। ইহাই মনুষ্য সমাজ। এই মনুষ্যসমাজ আবার ধর্ম্ম, বিশ্বাস, ভক্তি এবং রীতিনীতি আচার-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ের সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় অনুযায়ী পরস্পরে মতভেদ হইয়া নানাভাগে বিভক্ত হইয়া নানা-প্রকার সমাজের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আর মানব সকল আপন আপন ভক্তি, বিশ্বাস এবং রীতিনীতি আচারব্যবহার অনুযায়ী যাহার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া সেইরূপ সম্প্রদায় বা সমাজের নামানুসারে নিজের পরিচয় দিয়া থাকে।

সমাজসকলের উদ্দেশ্য শুধু নিমন্ত্রণ খাওয়া নয়, শিক্ষা, শাসন, সংরক্ষণ এবং সাধনা। ইহাদের শিক্ষা, শাসন, সংরক্ষণ এবং সাধনা-প্রণালী সমুদয়ই শাস্ত্র বলিয়া কথিত এবং সমাজভুক্ত সকলেই সেই সমুদয় মানিয়া চলিতে বাধ্য। দেশ, কাল ও পাত্রাদি বিবেচনা করিয়া এই সব শাস্ত্র গঠিত হইয়া থাকে এবং সমাজভুক্ত মানব-মণ্ডলীকে শিক্ষা দেয় ও শাসন, সংরক্ষণ এবং পরিচালন করিতে

থাকে। ইহাই সমাজ-বন্ধন, সমাজ-শাসন, সমাজশিক্ষা ও সমাজ-সংরক্ষণ ইত্যাদি যাহা কিছু।

কিন্তু আসল কথা—মূল ধন এক অনন্তের আধার অনন্তের অন্ত আকারবহু এক ঈশ্বর। এই অনন্ত সৃষ্টি এক ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, এক ঈশ্বরেই নিহিত বা এক ঈশ্বরেরই অন্তর্ভুক্ত। অসীম জগৎ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, গ্রহ, নক্ষত্র, কিন্তু এক ঈশ্বর। এক ঈশ্বর কিন্তু তাঁহার লীলা অনন্ত। সত্য এক, কিন্তু ছায়া অনেক—তাহার উদ্‌ঘাটন ও পালনপ্রথা অনেক; উপাস্য এক, কিন্তু উপাসনার প্রণালী বহু; ধর্ম্ম অনেক, কিন্তু তাঁহাদের নিয়ন্তা এক;—উদ্দেশ্য এক, উপাস্য এক—সেই অনন্ত ঈশ্বর। অসংখ্য—অগনিত জীব-মণ্ডলী জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে নিরন্তর অনন্তের আধার সেই ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে। আর, মানুষ ঈশ্বরের এই অনন্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাঁহারই তত্ত্ব নিরূপণে ব্যস্ত। মানুষ তাঁহাকে চায়। তারই জন্য মানুষের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ এবং শাস্ত্র এ সব যাহা কিছু। কাজেকাজেই মানুষ তা'রই অনুরূপ মানুষকে চায়, মানুষের সমাজ চায়। তাই মানুষ লোকালয়ে থাকে, তাই মানুষ সমাজ গঠন করিয়া সমাজে থাকে। কেন? কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন সত্যোদ্‌ঘাটন। মানুষ সম্প্রদায় গঠন করে কি সমাজ করে, সেই সত্যোদ্‌ঘাটনের সুবিধার জন্য, সেই সাধনা শিক্ষার জন্য। সমাজ সকল প্রকার সাধন প্রণালী শিক্ষার স্থান। এই শিক্ষার এবং সাধনার পরস্পর সাহায্যের জন্যই লোকে সমাজ গঠন করে এবং সমাজভুক্ত হইয়া সমাজে থাকে।

ইহাই সমাজের উদ্দেশ্য ও উপায়। কিন্তু যে সমাজে সত্যের মর্য্যাদা নাই, শিক্ষার সাহানুভূতি নাই এবং মনুষ্যত্বের গৌরব নাই, সে সমাজে থাকায় লাভ? সে সমাজের দরকার? যে সমাজের শিক্ষা অসত্য কথন, অসহায়কে নিপীড়ন আর অত্যাচারীর পদ-লেহন, সে সমাজে থাকার দরকার কি? কি সুখ? যে সমাজের কর্ম্ম সত্যের অপলাপ সাধন, পাপের প্রবাহ ছুটান, অধর্ম্মের পূর্ণ অভিনয় করণ, সে সমাজে থাকার উদ্দেশ্য? আর অবশেষে—যে সমাজে থাকায় কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের অপলাপ সাধন করিতে হয়, যেখানে থাকিলে মানুষকে মনুষ্যত্বহীন হইতে হয়, মানুষকে, সে যে মানুষ, তাহা পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দেয়, সে সমাজে থাকিয়া লাভ? এ সমাজে থাকিয়া কি শিক্ষা করা যায়? কি উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হওয়া যায়? এখানে থাকায় কি লাভ? যে সমাজের আশ্রয়ে থাকিলে কুশিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হয়, যেখানে থাকিলে সত্যের অপলাপ সাধনে সহায়তা করিতে হয়, যেখানে অধর্ম্মের নিত্য অভিনয়, যেখানে সৎসাহসকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হয়, অবশেষে যেখানে মানুষকে মনুষ্যত্বহারা হইতে হয়, সে সমাজে থাকায় কি লাভ? কি উপকার? মানুষ কি আশায় কেন সেখানে থাকিবে? কি শিক্ষা? কি উদ্দেশ্য? কি লাভ? কেন?

সাহেবদের গুণ।

সাহেবী সমাজ যে দেবসমাজ, তথায় যে পাপ নাই কেবল পুণ্যই আছে, অন্যায় নাই কেবল ন্যায়েরই অভিনয়, কুকর্ম্ম নাই

কেবল সৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান, অসাধুতা নাই কেবল সাধুতাই বর্ত্তমান, একথা বলিতে পারা যায় না। তাহাদের সমাজে স্বাধীনতা আছে, সুতরাং তাহারা সাহসী; কিন্তু অতিরিক্ত স্বাধীনতায় যে সব পাপ সমাজে প্রবেশ করিতে পারে তাহা যে করে না, কিংবা, সে সমুদয় পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান যে সেখানে হয় না, তাহা নহে। তাহাদের ভিতরেও সকলই হইয়া থাকে। এক কথায় তাহারাও মানুষ, সুতরাং মানুষের সমাজে যাহা হওয়া সম্ভব, তাহা সেখানেও অল্প বিস্তর হয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু সাহেবী সমাজ বলিয়াই, বিলাতী সভ্যতা বলিয়াই, আমরা যতটা নাক সিট্‌কাইয়া থাকি, ততটা নয়। যদি তাহাই হইত, যদি তাহারা ততটাই অধঃপতিত হইত, তাহা হইলে আজ তাহারা জগতে যে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, যে গৌরবধ্বজা উড্ডীয়মান করিয়াছে, যে সমুদয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা করা কখনও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। জগতে লোকে ইংরেজ, ফরাসী এবং জার্ম্মাণদিগের কীর্ত্তিকাহিনী রোমান ও গ্রীক্‌দের ন্যায়, অনেককাল কীর্ত্তন করিবে, তাহাতে কণামাত্রও সন্দেহ নাই। তাহাদের জাতীয় জীবনে, তাহাদের সামাজিক জীবনে, এবং তাহাদের নৈতিক জীবনে, তাহারা কে কিরূপ তাহা তাহাদের কার্য্যাবলীতেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তাহাদের চরিত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলে দেখা যায়, তাহারা কি অদ্ভুত ক্ষমতাশালী, কি অমিত শক্তিশালী, আর কি অপরূপ সত্যস্বরূপ। তাহার অন্যায় করিতে পারে কিন্তু অস্বীকার করিতে পারে না। তাহার

কুকর্ম্ম করিতে পারে কিন্তু কুচরিত্রের পরিচয় দেয় না। তাহারা অসৎপথ অবলম্বন করিতে পারে কিন্তু অসত্য বলে না। অন্যায়ের অভিনয় করিতে তাহারা যেমন সাহসী, সেই অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিতে তাহারা ততোধিক সাহসী। তাহারা নিতে যেমনি পটু আবার দিতেও তাহারা তেমনি দয়াপরায়ণ। তাহাদের চরিত্রবল অদ্ভুত, তেজ অসীম, আর সৎসাহস অসম। এ সব গুণ যদি তাহাদের ভিতরে এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান না থাকিত, তবে তাহারা সংসারে আজ এত উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিত না। তাহারা মানুষ—তেজস্বী মানুষ। সুতরাং তাহাদের কথায়, তাহাদের বার্ত্তায় এবং তাহাদের কর্ম্মে আমাদের নাক সিট্‌কাইবার কিছু নাই। কিন্তু শিখিবার অনেকই আছে। যদি মানুষ হইতে হয়, যদি উন্নত হইতে হয়, যদি এ জাতীর উদ্ধার হইতে হয়, তবে তাহাদের চরিত্র, কার্য্যকলাপ, শিক্ষা এবং সাহস এ সবগুলি বিশেষরূপে পাঠ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এবং মরালের ন্যায়, আপনার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিত্যাজ্য বিষয়গুলি পরিত্যাগ করত গ্রহণীয় বিষয়সমূহ পরিগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তাহা করিলেই বুদ্ধিমানের মত কার্য্য করা হইবে। এই সৎসাহস যদি আমাদের না থাকে, যদি মরালের ন্যায় আমরা দুধটুকু পৃথক্ করিয়া লইতে না পারি, তবে আমরা মানুষ নই। আমাদের মানুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়া এবং মানুষ বলিয়া দম্ভকরা অনুচিত। তোমার কাজে পরিচয় দাও যে তুমি মানুষ। কারণ, তাহা অনেক দিন টিকিবে, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া

থাকিবে। শুধু কথায় না, কেন না, অতি অল্পক্ষণ পরেই তাহা অনন্তে মিশিয়া যাইবে। কাজ কর, শুধু কথা কহিও না।

সাহেবদের সমব্যবহার।

সাহেবী সমাজে বিপত্নীক বৃদ্ধ যেমন পুনঃরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে সক্ষম, বিধবারাও তেমনি পুনরায় স্বামী গ্রহণে অধিকারিণী। তাহাদের সমাজ একচোকো নয়, সমদর্শী। দুই পক্ষেরই সমান অধিকার, সমান ক্ষমতা। একদিকে পাঁঠা, পায়স, পোলাউএ পোয়াবার, আর অন্যদিকে একবিন্দু পানীয় জল প্রদানেও অনভিপ্রায়; একদিকে পঞ্চাশেও প্রাণপ্রিয়তমা প্রভৃতি প্রণয় সম্ভাষণ, আর অন্যদিকে পঞ্চাদশ বর্ষীয়ার কুটিরপ্রান্তে বসিয়া "হে ভগবান্, এ দীপশূন্য, আলোশূন্য, নিরাশ, জ্বালাময় ভারবহ পাপ জীবনের শীঘ্র অবসান কর; এ নিষ্প্রভ নিরাশ—হতাশ প্রাণের ভার কতকাল বহন করিতে হইবে, কতদিন এ বৃথা জীবন বহন করিব, কতকাল এ জ্বালাময় জীবন বহন করিব?" ইত্যাদি মর্ম্মস্পর্শী বাণী, একদিকে অশীতি বর্ষ-বয়সের বৃদ্ধ ষোড়শী ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, আর অন্যদিকে, একাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে নিরম্বু একাদশীর উপবাস ব্রত পালন করিতে হইবে, এমন প্রথা তাহাদের সমাজে প্রচলিত নহে। এরূপ বিধি ব্যবস্থা ও বিচার বিবেচনা তাহাদের সমাজে দেখা যায় না। তাহাদের সমাজের দুটী চক্ষুর প্রতি—দুটী পক্ষের প্রতি তাহাদের সমান বিচার ও সমান ব্যবহার।

ইউরোপীয়ান স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ সতীধর্ম্ম পালন করে না।

কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা সতীত্বের কিংবা সতীর সম্মান করিতে ত্রুটী করে না, কিংবা কুণ্ঠিতা হয় না। কুমারীগণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে বলিয়াই সর্ব্বত্রই যে তাহারা স্বাধীনতার অপ-ব্যবহার করে, তাহা নহে। তবে কথা এবং তফাৎ এই যে, যদি কেহ তেমন কিছু করেও তবে তাহা সমাজের চক্ষে তেমন ব্যবস্থা, সংগস্থা কিংবা, ক্ষমার অনুপযোগী দোষণীয় হয় না। কিন্তু একটী কথা এই যে, তাহারা বিশ্বাসঘাতিনী প্রায়ই হয় না। অসতী হইতে পারে, কিন্তু অবিশ্বাসী কিংবা অসত্যবাদিনী হয় না। পরিত্যাগ করে, কিংবা পরিত্যক্তা হয় কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা প্রায়ই করে না। যতক্ষণ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক থাকিবে অথবা রাখিবে, ততক্ষণ বিশ্বাস বজায় রাখিবে। আর যখন অবিশ্বাসের বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইবে এবং অবিশ্বাসের কাজ করিবার সঙ্কল্প করিবে, পূর্ব্বেই পূর্ব্ব সম্বন্ধের শেষ করিবে। সম্পর্ক আর রাখিবে না। পরিত্যাগ এবং পরিবর্ত্তন তখন অনিবার্য্য।

আমেরিকা কিংবা ইউরোপীয়ান প্রদেশের বিধবাগণ ইচ্ছা করিলে আবার বিবাহ করিতে পারে। না হইলে, একাকীও কাল-যাপন করিতে পারে। সেখানকার কথাটা দরকার লইয়া, দরকার বোধ করিলে বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, সমাজ তাহাতে বাধা দিবে না বা কোনও আপত্তি করিবে না, আর পুনরায় বিবাহ করিতে না চাহিলেও সমাজ তাহাকে জোর করিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য করিবে না। সমাজ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, ঠিক সমদর্শী, এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন, আর সমাজভুক্ত স্ত্রীপুরুষের,

কেবল কতকগুলি বিষয় যাহা স্ত্রী-প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহা ছাড়া সমুদয় বিষয়েই সমান অধিকার, স্ত্রী এবং পুরুষ সমানভাবে সম্মানিত।

সমদর্শিতা কি শুদ্ধ ললনাগণের প্রতিই প্রদর্শিত ?

এই সমদর্শিতা কেবল যে স্ত্রীলোকের প্রতিই প্রদর্শিত হয়, তাহা নহে। ইহা তাহাদের সর্ব্ব বিষয়েই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নিজেরা সমাজে এবং স্বদেশে যে স্বাধীনতা ভোগ করে, অন্যকেও তাহারা সেই স্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দিয়া থাকে। ইহারা স্বার্থপর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা স্বজন-গণ বিদ্রোহী নহে, সেখানে তাহারা অতিশয় ন্যায়পরায়ণ। ইহাদের স্বার্থের নজর বড়, ছোটখাট স্বার্থের জন্য অন্যের সর্ব্বনাশ প্রায়ই করে না। আমাদের মত একহাত যায়গার জন্য—একহাত স্থান অন্যায় অপহরণ করার জন্য—সামান্য স্বার্থের জন্য অপর একজনকে বৃথা নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করে না। ইহারা আমাদের ন্যায় এরূপ হতভাগা, পরশ্রীকাতর নহে। ইহারা দেবতা নহে, মানুষ—, কিন্তু পিশাচ নহে। ইহাদের শক্তি আছে, সাহস আছে এবং মনুষ্যত্ব আছে। ইহাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভর অতীব প্রশংসনীয়।

আর আমরা—আমরা কি ?

আত্মবিশ্বাস—আত্মনির্ভর শূন্য, পর-মুখাপেক্ষী, পরশ্রীকাতর, কাপুরুষ। অথবা মনুষ্যত্বশূন্য মানবরূপী সামান্য পশু। একহাত স্থানের অন্যায় অধিকারের জন্য আত্ম-কলহের সৃষ্টি করিয়া

একজনকে বৃথা নির্য্যাতন করিতে পারি,—দুর্ব্বল প্রতিবেশীকে অকারণ যথেচ্ছা প্রপীড়ন করিতে পারি, বিপুল সম্পত্তি বিলাসিতায় কিংবা অলসতায় বিসর্জ্জন দিয়া আধ পয়সার জন্য একজন আত্মীয়ের প্রাণদণ্ড করিতে পারি ; একসিকি লাভের জন্য কোমরের কাপড় মাথায় বাঁধিয়া জল সাঁতরাইয়া অকুণ্ঠিতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যাইতে পারি। কুকর্ম্ম কিংবা কুকুরের বৃত্তি গ্রহণ করিতে আমরা কণামাত্র কুণ্ঠিত হই না। পর পদলেহন আমাদের প্রধান ব্যবসা। পরশ্রী এবং পরস্ত্রী হরণ করা আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আমোদের বিষয়। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারি না। এমন কি অনেক সময় নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে সক্ষম হই না; সুতরাং অনেক সময়ই নিজের উপর নিজের নির্ভর করা মহামুস্কিল হইয়া দাঁড়ায়। কি ভীষণ—কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন !! আর কেবল কতকগুলি মিথ্যা অমূলক সংস্কার মাথার উপর চাপাইয়া রাখিয়া চিনির বলদের ন্যায় বৃথা বোঝা বহিয়া বেড়াই, অথবা চোকে ঠুলি পরান কলুর বলদের মত অন্ধ আমরা কেবল ঘানির চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াই! আর পরিণাম? তৈল খৈল সব কলুর, আর বলদের ভাগ্যে শুক্‌না ঘাস আর পচা পানি!

আমাদের অধঃপতন কিরূপ ?
আমাদের চরিত্র কেমন ?

আমাদের অধঃপতন অদ্ভুত। দুনিয়াতে বোধ হয় এরূপ আর কাহারও—কোন জাতিরও হয় না। অধঃপতন অনেকেরই হইয়া

থাকে এবং হয়, কিন্তু এরূপ বোধ হয় কাহারও হয় না। অন্ততঃ এযাবৎ কাহাকেও দেখা কিংবা কাহারও কথা শ্রুত হওয়া যায় নাই। হায় রে পোড়া দেশ! এই কি অবশেষ?

আমরা সম্প্রতি শিক্ষিত বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, কিন্তু সে শিক্ষা আমাদের পক্ষে কতদূর হিতকরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা, হায় রে, শিক্ষার এমনি প্রভাব, একটিবার ভালরূপে ভাবিয়া দেখিবার অবসরও পাই না। আমরা যে কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচ গ্রহণ করিয়াছি, একথা একবারও আমাদের মাথায় আসে না। আমরা যখন অসভ্য, অশিক্ষিত—বর্ব্বর ছিলাম, তখনও আমাদের মনুষ্যত্ব ছিল, সত্য কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল, সৎসাহসের পরিচয়ের অভাব ছিল না। আর এখন আমরা শিক্ষিত হইয়াছি, সাহস এখন আমাদের একেবারে সঙ্গ ছাড়িয়াছে—সত্য একবারে ভিত্তিশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস অতি বিরল এবং বিনয় বিপত্তির মূল হইয়া বসিয়াছে। কাহারও কথা কাহারও বিশ্বাস করিবার উপায় নাই; করিলে অনেক সময়ই বিপদপাতের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। এখনকার কথা—"সত্য কথায় কি হইবে" তদপেক্ষা সত্য রৌপ্যখণ্ডের মূল্য অধিক। আজ রৌপ্য-খণ্ডের বিনিময়ে তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, ধন মান প্রাণ যাহা কিছু সমস্তই ঐ সুগোল সুচকচকে রজত মুদ্রা! ইহার জন্যে আজ আমরা কি না করিতে পারি? কিন্তু এ ভারতে একদিন এমনিই গিয়াছে যে তখন ইহার মূল্য অতি অল্পমাত্র ছিল। আর্য্য ঋষিগণ ইহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেন। সে ত অনেক

দিনের কথা, এই আমাদেরই শৈশবে দেখিতে পাইয়াছি ইহার আদর কত? এবং ইহার মূল্যই বা কত। তখন মানুষের মুখের কথার মূল্য ইহাপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। টাকা ধার দিতে কাগজ, কলম, কালি কিংবা সাক্ষীর প্রয়োজন বড় বেশী হইত না। মুখের কথায়ই দেনা পাওনা চলিতে পারিত। তখন মুখের কথার মূল্য ছিল। ভারতবাসী সত্য কথা বলিত। কিন্তু তখন, এখন যেরূপ বলে, আমরা অশিক্ষিত, অসভ্য—বর্ব্বর ছিলাম! আর এখন? এখন আমরা সুশিক্ষিত—সভ্য বলিয়া কথিত, কিন্তু সে বিশ্বাস, সে সত্যবাদিতা, সে সৎসাহস কোথায়? সে সত্যপ্রিয়তা নির্ভয়তা,—সে মনুষ্যত্ব কোথায়? আমরা আজ শিক্ষিত, কিন্তু মনুষ্যত্বহীন মনুষ্য, অমানুষ—কাপুরুষ বনিয়া যাই নাই কি? এই কি শিক্ষার ফল? এই কি সভ্যতা? যে শিক্ষার ফলে সত্য পথ পরিত্যাগ ক'রে অসত্য পথ গ্রহণ করিতে হয়, যে শিক্ষার ফলে ন্যায় পরিত্যাগ ক'রে অন্যায় অবলম্বন করিতে হয়, যে শিক্ষায় সাধুতা পরিত্যাগ করাইয়া অসাধুতা শিখায়, যে শিক্ষায় দয়া ভুলাইয়া নির্দ্দয়তা শিখায়, যে শিক্ষায় সৎসাহসের পরিবর্ত্তে ভীরুতা শিখায়, যে শিক্ষায় মানুষের মনুষ্যত্ব কাড়িয়া লইয়া মানুষকে অমানুষ—কাপুরুষ করিয়া দেয়, সে শিক্ষা তোমরা চাইতে পার, আমি চাই না। সে শিক্ষাকে তোমরা মূল্যবান্ মনে করিতে পার, আমি করি না। সে শিক্ষার দরকার বোধ তোমরা করিতে পার, আমি করি না। আমার সে শিক্ষায় কাজ নাই, আমি সেরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইব না। চিরদিন অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্ব্বর হইয়া

থাকিব তাও ভাল। আমি তাই চাই যা আমি একদিন ছিলাম, তাহাই আমার পক্ষে ভাল। যদি কখনও উন্নতি করিতে হয়, উন্নত হইতে হয়, চুনিয়া দেখিয়া তা'রই উপরে উন্নতি করিব। নইলে এরূপ উন্নতি আমি চাই না। যেরূপ উন্নতিতে আমাকে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, যেরূপ উন্নতিতে আমার সত্য কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না, যেরূপ উন্নতিতে আমাকে সত্য পথ বিচ্যুত করায়, সেরূপ উন্নতি আমি চাই না।

দেশের অবস্থা এমনি! সমাজের অবস্থা এমনি শোচনীয়! আর আমাদের পারিবারিক অবস্থা এমনি পরিতাপজনক। আজ কালের সভ্যতা আমাদের হাতে পায়ে, চোখে মুখে—সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আমরা নড়িতে চড়িতে অক্ষম। শুধু তাই নয়, এ সভ্যতা শুদ্ধ আমাদিগকেই ধরে নাই, এই সভ্যতা আজ আমাদের অন্দরমহলে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছে এবং সে আরও জ্বালাতন! যে ভারত-ললনাগণ একদিন আপন কেশপাশ ধনুকের জ্যা প্রস্তুতের জন্য কাটিয়া দিত, আপনার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের খরচ যোগাইত, যাহারা একদিন আপন হস্তে স্বামী এবং পুত্রদিগকে রণ-সজ্জায় সাজাইয়া দিত, আজ, কালবশে—শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে সেই বীরাঙ্গনারা শুধু বিলাসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই শক্তিরূপিণী শক্তিশালিনীরা আজ শক্তিহীনা অবলা নাম গ্রহণ করিয়াছে। কি দুঃখ! কি পরিতাপের বিষয়! সভ্যতায় বিলাসিতা বাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু আয় বাড়ায় নাই; আয় একভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সভ্যতার এবং শিক্ষার আলস্য নাই। তাহারা অন্দর-

মহলে প্রবেশ করিয়া এইবার গৃহিণীদিগকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, গৃহিণীদিগের আব্দার বাড়িয়াছে। বিলাতী বেশ-ভূষায় ভূষিত না হইলে, বিলাতী চালচলনে না চলিতে পারিলে, আজ তাহাদের চলে না, বিলাতী রকম না হইলে তাহাদের আর মন উঠে না। সুতরাং আব্দার রাখিতেই হইবে, কি দুঃখ! কি পরিতাপ! কিন্তু মিন্‌সের যে মোটেই কুলায় না, আয়ের ঘরে যে একই ভাব। কিন্তু তা' বলিলে কি হয়, তুমি চুরি কর, জুয়াচুরি কর, ডাকাতি কর, ছুঁচোমি কর, আর ধেড়েমি কর, আব্‌দার কিন্তু আবদারই, আব্‌দার রাখিতেই হইবে। তুমি মর, তা'তে ক্ষতি নাই, কিন্তু মরিবার সময় তুমি কি রাখিয়া যাইতেছ, তাহাই দ্রষ্টব্য। তুমি মরিয়াও কিছু রাখিয়া যাও, সে তোমার কর্ত্তব্য, তাহা তুমি করিতে বাধ্য। কেন না, বিবাহ করিয়াছ অন্যায় করিয়াছ, পাপ করিয়াছ, প্রায়শ্চিত্য করিতেই হইবে। তোমার কর্ত্তব্য তোমায় পালন করিতেই হইবে। কিন্তু কর্ত্তব্য যে পরস্পর তাহা কেউ বুঝে না, কেউ বলে না। কি বিষম! কি ভীষণ! সভ্যতার কি অপরূপ রূপ! এইরূপই আমাদের অধঃপতন, এবং আমাদের চরিত্রও এই প্রকারই বটে। কিন্তু এ অধঃপতন কিসে হইল? এ অধঃপতন আমাদের কে করিল? আমাদের মাথার মণি কে হরণ করিল?

সৎশিক্ষার অভাবই এ সমস্ত অধঃপতনের মূল। শিক্ষার অভাবে সমাজ রসাতলে যে'তে ব'সেছে, সুশিক্ষার অভাবে সমাজ কদাচার, কুক্রিয়া, মিথ্যা ব্যবহার প্রভৃতি পৈশাচিক বৃত্তির অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবে সৎসাহস লোপ

পাইতে বসিয়াছে। এ দেশের লোক মনুষ্যত্ব হারাইয়া অমানুষ হইয়া বসিয়াছে। এখন কোনরূপ সৎকর্ম্মের কথা উল্লেখ করিলে, কোনরূপ সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিলে, কোন প্রকার সৎসাহসের কর্ম্ম সম্পাদন করিতে বলিলে, এই বাঙ্গালা দেশে—সহরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, ঘরে ঘরে, যেখানেই যাও কিংবা বল, প্রায় প্রত্যেক স্থানেই 'ও' বাঙ্গালী? বাঙ্গালী দ্বারা অসম্ভব।" কেবল এই সব বাক্য শ্রবণ করিতে হয়। শুধু শ্রবণ করিতে হয় তাই নয়, সত্য সত্যই সে প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হয়। অন্যথা অগৌণেই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিতে বাধ্য হইতে হয়। আর নেহাৎ নাছোড়বন্দা হইয়া বসিলে, অল্প কাল মধ্যেই সভা ভঙ্গ করিয়া সকলে ছাটুছুটু বিদায় হইতে থাকে। কিছু বলিতে হইলে, বক্তাকে অনেক সময়ই শূন্যমন্দিরে বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করিতে হয়। তবে যদি কেহ বহু কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করে, তবে সে "মহাশয়, ওটা নেহাৎ হাস্যাস্পদ কথা, নিতান্ত অসম্ভব—পাগ্‌লামী; না, আত্মহত্যার কথা! রেখে দিন, ও কোন কাজের কথা নয়। বাঙ্গালী করিবে? বাঙ্গালী?" যেন বাঙ্গালী মানুষ নয়! এ কেবল পল্লীগ্রামের কথা নয়, সহরে, নগরে, গ্রামে, ঘরে, মাঠে, ঘাটে যেখানে যাও যেখানে বল, সর্ব্বত্রই শুনিবে "ও বাঙ্গালী!"

বাঙ্গালী কি মানুষ নয়?

সাদাসিদে পল্লীবাসী নিরক্ষর, নিরন্ন গ্রাম্যকৃষক যে শুধু ইহা বলিয়া থাকে তাহা নহে, সহরবাসী শিক্ষিত সুসভ্য বাঙ্গালীগণই

এ বিষয়ে অধিক পটু ; তাঁহারাই এ বিষয়ে অধিক বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া থাকেন ! কারণ, তাঁহারা শিক্ষিত এবং সভ্য। আর বলিতে কি, এ বিষয়ে যাঁহারা বিলাতফেরত—বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা আরও অধিক পটু। এবং বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, এমন কি, দুই চারি জন আমেরিকাপ্রত্যাগত যুবকেরাও এই প্রকার মতেরই অনুমোদন করিয়া থাকেন এবং তাহাতে কিছুমাত্রও লজ্জা বোধ করেন না। যে দেশ নির্জ্জীবকে সজীব করে, যে দেশ নিপীড়িতকে সান্ত্বনা দেয় যে দেশ পরাধীনতা-পেষিতগণকে স্বাধীনতারসে সঞ্জীবিত করিয়া দেয়, যে দেশ দুর্ব্বলকে সবল করে, যে দেশ মনুষ্যত্বহীন মুমূর্ষুকে মনুষ্যত্ব দান করিয়া থাকে, এবং যে দেশ মানুষকে মনুষ্যত্ব কি, মানুষের অধিকার কি, আয়ত্ত কি, দাবী এবং দায়িত্ব কি ইত্যাদি শিখাইয়া দেয়, বড়ই দুঃখের বিষয় সে দেশে শিক্ষিত—সে দেশপ্রত্যাগত যুবকগণও একই সুরে সুর বাঁধেন এবং একটুও তা'তে লজ্জা বোধ করেন না। ধন্য বটে ! ধন্য দেশের জল হাওয়া ! আর ধন্য এদেশের মাটীর গুণ !

এইরূপই বটে। দেশের সর্ব্বত্র—সকল স্থানেই ঐ একই মাত্র কথা "ও, বাঙ্গালী !" যেন বাঙ্গালী মানুষ নয় ! এ দুনিয়ায় বাঙ্গালী যেন অন্য কোন প্রকার একটা কিছু অদ্ভুত জীব ! যেন বাঙ্গালী মানুষের গর্ভে, মানুষের ঔরসে জন্মে নাই। যেন বাঙ্গালী মাতৃস্তনে এবং পিতৃস্নেহে লালিতপালিত হয় নাই ; অথবা—বুঝি বা বাঙ্গালীর জন্মপ্রক্রিয়া ও জন্মপ্রথা জগতের অন্যান্য মানবমণ্ডলীর জন্মপ্রক্রিয়া ও জন্মপ্রথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই

মানুষের যে মনুষ্যানুযায়ী ক্ষমতা, মানুষের যে অধিকার ও মনুষ্যত্ব, মানুষের যে আধিপত্য এবং মনুষ্যোপযোগী সম্মান সম্বর্দ্ধনা, এ সব কিছুতেই বাঙ্গালীর অধিকার নাই। অতএব মানুষে যাহা করিতে পারিয়া থাকে কিংবা পারে, বাঙ্গালী তাহা পারে না। কি করিয়া পারিবে? বাঙ্গালী কি করিয়া সে সমুদয় করিতে আশা করিতে পারে? বাঙ্গালী যে মানুষ নয়! বাঙ্গালী কি? বুঝিবা এ সৃষ্টির বাহিরের আর কিছু হইবে?

কিন্তু বাঙ্গালীরও যে মানুষের মত দুইখানি হাত, দুইখানি পা আছে; তাহারও যে মানুষের মত নাক, মুখ, চোখ, কাণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আছে; তাহারও যে মধু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি আস্বাদ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে; সেও যে মানুষের গর্ভে, মানুষের ঔরসে এবং একইরূপ প্রক্রিয়ায় মানুষেরই মত জন্মিয়াছে; মানুষেরই দ্বারা, মানুষেরই স্নেহে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং অবশেষে আবার মানুষেরই মত মরিয়া থাকে? পৃথিবীতে অন্য মানুষেরও যেমন মন আছে এবং অন্য দেশীয় কিংবা অন্য জাতীয় লোকও যেমন চিন্তা করিতে পারে, ইহাদেরও যে তেমনি একটি মন আছে, একটি প্রাণ আছে এবং ইহাদেরও মধ্যে যে দয়া দাক্ষিণ্যাদি সব গুণ আছে? ইহাদিগকেও যে মানুষ বলিয়া অনুমান হয়? ইহারাও যে চিন্তা করিতে পারে? তবে কি ইহারাও মানুষই? কিন্তু তা'হলে কেন বাঙ্গালী "বাঙ্গালী" বলিতেই—বাঙ্গালীর কথায়ই "ও', বাঙ্গালী" বলিয়া ওরূপ চেঁচাইয়া উঠে এবং ওপ্রকার নাক সিঁটকায়? কোনও যুগে বাঙ্গালী কি

মানুষের ন্যায় কখনও কিছু করে নাই? চিরদিনই কি বাঙ্গালী অক্ষমতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে? বাঙ্গালীর কি অতীত একেবারেই অন্ধকার? এজাতির কি অতীত একেবারেই নাই? বুঝিবা তাই—বুঝিবা বাঙ্গালার ভাগ্য চিরদিনই এইরূপ?

কিন্তু বাঙ্গালার বল্লাল, আদিশূর প্রভৃতি নৃপতিগণকে বঙ্গজননীই গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাই তাঁহাদের জন্ম-স্থান। এই বাঙ্গালার বাঙ্গালী বক্ষে, বাঙ্গালী স্নেহে, এই সুনীল বঙ্গ আকাশের নীচে এবং বাঙ্গালার বাতাসেই তাঁহারা লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত। তাঁহারাও বাঙ্গালীই ছিলেন। রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালন ইত্যাদি বিষয়ে ইঁহারা কি, কোন অংশে নিকৃষ্ট বা কম শক্তিশালী ছিলেন?

তার পর বঙ্গজননীরা চিরদিনই যে ননীর পুতুল সব প্রসব করিয়া আসিয়াছেন, কখনও তাঁহারা বীরপ্রসবিনী ছিলেন না, তাহাই বা কিরূপে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি? পরের কথায় কি সকলই স্বীকার করিতে হইবে? কিরূপে করিব? এই যে সে সেদিনের কথা! বাঙ্গালার শেষ বীর—বাঙ্গালীর গৌরব—প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, বসন্তরায়, প্রভৃতি আজিও বাঙ্গালীর স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হন নাই? আজিও যে বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগকে স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই! ইঁহাদিগকেও যে বঙ্গ-জননীগণই প্রসব করিয়াছিলেন। ইঁহারাও যে বাঙ্গালী—এবং বাঙ্গালী উপদানেই গঠিত হইয়াছিলেন? এই বাঙ্গালায়ই তাঁহারা লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন!

তাঁহারাও বাঙ্গালীই ছিলেন। তা' ছাড়া, তার পর, কেবল কয়েটীমাত্র নূতন—এ আমলের জমিদার ব্যতিরেকে বাঙ্গালার প্রত্যেকটি জমিদার-ঘরই সেকাল এবং সে আমলের বাঙ্গালী বাহুবলের পরিচয় বা সাক্ষী স্বরূপ আজিও দণ্ডায়মান? নয় কি?

আর তার পর ধর্ম্ম-জগৎ! সেখানেও বাঙ্গালী কম নয়। সেই বিশ্বপ্রেমের আধার চৈতন্যদেব এই বঙ্গভূমেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিও বাঙ্গালী, তাঁহার গর্ভধারিণীও বাঙ্গালী ললনাই ছিলেন। আর, এই সে দিন না সাধকচূড়ামণি মহাপুরুষ রামকৃষ্ণদেব বাঙ্গালা দেশ ও বঙ্গগৃহ ধন্য করিয়া বাঙ্গালীকে গৌরবান্বিত করিয়া গেলেন? আর তার পর আবার তৎশিষ্য বিবেকানন্দ।

কোন্ গুণে বাঙ্গালী নিকৃষ্ট? কোন্ বিষয়ে কোন্ দিন বাঙ্গালী অশ্রেষ্ঠ? কিসে বাঙ্গালী অবজ্ঞেয়? এবং কোন্ দিনে? এমন কি, এই দুর্দ্দিনেও বাঙ্গালী বাঙ্গালার মর্য্যাদা—বাঙ্গালীর মর্য্যাদা ও বাঙ্গালীর গৌরব বজায় রাখিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, রাসবিহারী, প্রতুলচন্দ্র, হরিনাথ এবং অরবিন্দ ইঁহারা কে কম? পৃথিবী এরূপ কয়টা সুরেন্দ্র বা রবীন্দ্র জন্মাইয়া থাকে? যদি ইঁহারা কোন স্বাধীন দেশে—স্বাধীন সমাজে জন্মিতেন, অথবা—এই দেশই যদি স্বাধীন দেশ হইত, তবে তাঁহাদের আসন আজ আরও অনেক উচ্চে অবস্থিত দেখিতে পাইতাম। কিন্তু হায়! যাক্ এখন সে স্বপ্নের কথা! তবে ইঁহাদের প্রত্যেকেই যে এক একটী রত্ন—মানুষের মত মানুষ

এবং কোন অংশেই যে বিদেশী তুলনায় নিকৃষ্ট নহেন, এ কথা জোর করিয়া বলা যায়। এবং ইহারাও বাঙ্গালী ?

বাঙ্গালী, তার পর, এ আমলেও আজ পর্য্যন্ত যে যে বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই বিভাগেই, নানা প্রকার বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এদেশবাসীর পক্ষে যতদূর সম্ভব, উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছে। মস্তিষ্কপরিচালনায় বাঙ্গালী অতিশয় পরিদর্শী, একথা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। আছে কি ?

তবে একমাত্র সামরিক বিভাগেই এ আমলে এ পর্য্যন্তও বাঙ্গালী কোন ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে নাই। সেটা যে তাহাদের ত্রুটি সেরূপ বলা যায় না ; যদি তাহারা এই বিভাগেও অন্যের ন্যায় প্রবেশাধিকার পাইত তবে এখানেও যে তাহারা অক্ষমতা কিংবা অকৃতকার্য্যতার পরিচয় দিত এরূপ অনুমানও করা যায় না। কেননা, যাহারা মস্তিষ্কপরিচালনায় এত পারদর্শী, তাহারা যে এই বিভাগেও অকৃতকার্য্য হইত বা হইতে পারিত এরূপ অনুভব করাও অন্যায়। বাঙ্গালী মরিতে নেহাৎ অপ্রস্তুত নয়। Volunteer corps এর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়া তদুত্তরে যাহা দেখা গিয়াছে, তদ্দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, বাঙ্গালী মরিতে পশ্চাৎপদ নহে, বরং অতিশয় অগ্রগণ্য এবং বিশেষ সুখীই হইত যদি তাহারা এ বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত।

তবে বাঙ্গালী কিসে নিকৃষ্ট ? কেনই বা তাহারা এত প্রকার বিশেষণ সহযোগে উচ্চারিত ? কোন্ বিষয়ে বাঙ্গালী অক্ষম বা অপারক ? কোন্ কার্য্যে তাহারা অকৃতকার্য্য ? তবু বাঙ্গালী

"ও' বাঙ্গালী", তবু বাঙ্গালী অমানুষ। তবু বাঙ্গালী স্ত্রীস্বভাব-সম্পন্ন। কেন? কিসের অভাব? কি জন্য বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক? কি চাই? বাঙ্গালী, তুমি মানুষ, মানুষের গর্ভে, মানুষের ঔরসে—মানবীয় প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমিও মানুষের ন্যায় মানুষের যত প্রকার অধিকার তাহা লাভ করিতে পার। একবার অতীতের দিকে অবলোকন কর, একবার লুপ্ত গৌরবের দিকে তাকাও, দেখিবে, তুমি কি ছিলে আর কি হইয়াছ? অতীতে যাহা ছিল, ভবিষ্যতে কি তাহা হইতে পারে না? আবার কি তুমি মানুষ হইতে পার না? এ কলঙ্ক-কালিমা কি মুছিয়া ফেলিতে পার না? অবশ্যই পার; বাঙ্গালী তুমি মানুষ ছিলে, আবার মানুষ হইতে পার। কিন্তু তোমার পাপের পূরাপূরি প্রায়শ্চিত্য চাই; সমাজকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া গলদগুলি বাহির করিয়া দিয়া কুসংস্কারমুক্ত করিয়া পুনরায় নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। দেখ দেখি, সমাজে কত কি রহিয়াছে? এখানে দেখ বৈষ্ণবের দল। চৈতন্যদেব অবশ্যই এদেশের মঙ্গলের জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভালবাসা—'প্রেম' তাহার মূল মন্ত্র। হিংসা, দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া আত্মপর ভুলিয়া যাইয়া, মানুষ মানুষকে ভালবাসুক, প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রেমালিঙ্গনে পরিতুষ্ট করুক, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য স্বীকার করি, তাঁহার প্রেমও অতি প্রশংসনীয়—অতি আদরের—অতি মহৎ; কিন্তু আজ দেখ দেখি, বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদের কি অবস্থা এবং কি ব্যবস্থা? যত সব নেড়া-নেড়ীর দল হইয়া পড়িয়াছে। সে ভালবাসা, সে স্বর্গীয় প্রেম,

সেই দৈববাণী সদৃশ প্রেমের ধ্বনি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সে স্থল আজ কেবল নেড়া-নেড়ীদের কুপ্রণয় ও সেই প্রণয়-গাথায় পরিণত হইতেছে। যে বৈষ্ণবেরা একদিন সেই স্বর্গীয় প্রেমে উন্মত্ত হইয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেই ভাব দেখিয়া যদি কেহ, যদি কিছু এবং যাহা কিছু দিত তাহাই গ্রহণ করিতেন, আজ সেই বৈষ্ণবধর্ম্মদীক্ষিত বৈষ্ণবগণ ভিক্ষা-বৃত্তিকে ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে এবং যত সব অকর্ম্মণ্য, আল্‌সে, অধম, চরিত্রহীন নর-নারীগণ কর্ম্ম করার ভয়ে ভীত হইয়া অনায়াসে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া বৈষ্ণব সাজিয়া বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক বাড়াইতেছে। বৈষ্ণব হওয়া এখন আর ধর্ম্মের জন্য নহে, কেবল মাত্র আরামে বসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য।

এই সম্প্রদায় এখন আর ধর্ম্মসম্প্রদায় বলিয়া কথিত হইবার উপযুক্ত নয়, ইহারা ভিক্ষা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ইহাদের কর্ম্ম এখন ধর্ম্ম নয়, ভিক্ষা এবং ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসমূহ বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে সমাজের একটী বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিনা কাজে কেবল মাত্র ধর্ম্মের ভাণ করিয়া—ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সমাজের ধন ধান্য হরণ করিতেছে। চেয়ে দেখ, বৈষ্ণবসম্প্রদায়! ইহা কত বড়! ইহাতে কত লোক আছে এবং দিন দিনই ইহার আশ্রয়ে থাকিয়া আয়াস ভোগ করিতে প্রতিনিয়ত কত লোক যাইতেছে! ইহারা সমাজের কোনও কাজে আসে না, সমাজ ইহাদের দ্বারা কোনওরূপে উপকৃত বা লাভবান হয় না।

কিন্তু তথাপি সমাজ ইহাদের বহন করিতেছে ; ইহারা অকারণ সমাজের ঘাড় চাপিয়া অন্যায় রূপে অন্নধ্বংস করিতেছে। কেহ কি বলিতে পার, ইহারা সমাজের কোন উপকারে আসিয়াছে ? বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলা বাড়াইতেছে, তাহাদের দৃষ্টান্তে কত সংসারে আগুন লাগিতেছে, কত সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে ; এবং তাহাদের দৃষ্টান্তে সমাজের কত অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। সমাজ কেন দুধ দিয়া এ কালসাপ পুষিতেছে, কেন অন্নদিয়া অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনিতেছে, কেন ভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুকের দল বাড়াইতেছে ? ইহারা কি সমাজের কোনও কাজে আইসে, সমাজ কি কোনওরূপে ইহাদের দ্বারা উপকৃত হয় ? তবে কেন এভার বহন করা ? সমাজ কি এই ভিক্ষা বন্ধ করিতে পারে না, এই অধঃপতন কি অমঙ্গলের পথ নষ্ট করিতে পারে না ? তবে করে না কেন ? বলিবে—একমুঠা অন্ন দান করায় পুণ্য আছে, কেমন ? কিন্তু এতে যে পুণ্য হয় না, পাপ হইতেছে—এ অন্যায় দানে যে পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। ভিক্ষা দিতেছ, বেকার আয়াসে বসিয়া খাইতেছে, ইহা দেখিয়া অধম নরনারী সংশোধিত হইতে নিশ্চেষ্ট হইয়া আরও সেই দিকে ছুটিয়া যাইয়া দল বাড়াইতেছে, সমাজ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। এ কি পুণ্য না পাপ বাড়ান ? পুণ্য না অন্যায় কার্য্য ? একি দান, না আপনার পায়ে কুড়ুল মারা ? দান করিতে হয় কর—কিন্তু পাত্র বুঝিয়া, অপাত্রে নয়। কেন না, যে দানের পাত্র—যে অপারগ, অক্ষম, আপনি জীবিকা অর্জ্জনে একেবারে অসমর্থ, অন্ধ, খোঁড়া আতুর, তাহাকে দান কর, তাহাতে পুণ্য হইবে ; আর আল্‌সে,

নিষ্কর্ম্মা, আয়াসে জীবনযাপনেচ্ছু ভ্রষ্টচরিত্র নরনারীকে ভিক্ষা দাও পাপের মাত্রা বাড়িয়া চলিবে, দানে পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপ হইবে; আর সেই পাপে দিন দিন সমাজ শ্মশানের দ্বারে উপস্থিত হইবে। আর সমাজের নেতৃবৃন্দ কি করিতেছেন? অদূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছেন, আর পূর্ব্ব পুরুষের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। কি অপূর্ব্ব অভিনয়ই বটে!

দান করিবে কর—কিন্তু ভালভাবে বুঝিয়া সুজিয়া, পাত্র দেখিয়া দান কর; যাহাতে পুণ্য হইবে, দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে, সমাজের উপকার করিবে, আর তারপর আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। দান করিবে কিন্তু উপযুক্ত বিধানানুযায়ী; যাহাতে সমাজের বোঝা বাড়িবে না, সমাজের ঘাড়ের বোঝা ভারী হইবে না, যাহাতে সমাজের অপকার করিবে না। তা' না হ'য়ে এ কি দান! এ দানে যে সমাজ ডুবিতে চলিল। চেয়ে দেখ দেখি, বৈরাগী বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিক্ষুকদের সংখ্যা কত? হিসাব দেখ দেখি, দিন দিন ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে কি না? কিন্তু হায়, সংস্কার! হায় রে! 'সংস্কার'ই এদেশকে খাইল! 'দেশাচার'ই এদেশকে ডুবাইল!

বৈষ্ণবদিগের অবস্থা।

সেদিন একটি লোক আসিয়া বলিল, "মহাশয় আমি বৈরাগী হইব, আর কাজকর্ম্ম করিব না।" আমি বলিলাম, "কেন, কি হইয়াছে?" তদুত্তরে সে কহিল, কাজ করিয়া কি করিব মহাশয়?

কি লাভ ? সারাদিন মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া বহু পরিশ্রমে আমরা যাহা রোজগার করি, তাহাতে আমাদের অতি কষ্টে দিন কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু কোন দিন একটি পয়সাও সঞ্চয় হয় না, বরং মাঝে মাঝে হাওলাৎ বরাতই করিতে হয় ; আর বৈরাগীরা বিনা আয়াসে কেবল মাত্র বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া যাহা পায় তাহাতে তাহারা খাওয়া পরা বাদেও কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে এবং দুই চারিটা জিনিস পত্রও করিয়া থাকে। আপনি চলুন, দেখিবেন একজন বৈরাগীর ঘরে যে জিনিস পত্র আছে, আমাদের কয় জনের ঘরে তাহা আছে ?”

আমি। বল কি হে !

লোকটি। আজ্ঞা হাঁ, আজকাল বৈরাগীদের অবস্থা এমনই বটে ! বল্‌ব কি ম’শায়, এই অল্পক্ষণ হ’ল তারকদাস বৈরাগী দেখেছি ভিক্ষায় গেল। আর ঘণ্টা চারি বাদে যখন সে ভিক্ষা ক’রে আখড়ায় ফিরে গেল, তখন দেখিলাম সে বেশ বড় এক থলে ধান বয়ে লয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ‘ঠাকুরদা’ ধান কি দর ? সে বলিল ‘আমাদের আর দরটর কি ? বৈষ্ণবেরে দয়া করিয়া যে যা’ দুই এক মুঠা খাইতে দেয়, এ তাই, এ কেনা ধান নয়।’ ম’শায়, বৈরাগীর কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি ! সেই হইতে ভাবছি আর কাজকর্ম্ম কর্‌ব না, এবার বৈরাগী হব।

আমি। তা’ হতে পারে ; তারকদাস গাইতে-টাইতে পারে তাই লোকে তা’কে অন্যের চেয়ে কিছু বেশী দেয়।

লোকটি। আজ্ঞা না ম’শায়। আচ্ছা তা’কেই যেন লোকে

সে গাইতে পারে বলিয়া বেশী দেয়, কিন্তু টুনু বৈরাগী ত আর গাইতে জানে না ?

আমি। না।

লোকটি। আজ্ঞা, সে কি রকম কর্‌ছে জানেন ?

আমি। না ; কি কর্‌ছে ?

লোকটি। এই মাস দু'এর ভিতরে প্রায় ভরাচারি ধান এনেছে !

আমি। বল কি হে !

লোকটি। আজ্ঞা হাঁ, এইরূপই বলি ; সে আমাদেরই বাজারের ঘাট থেকে নৌ'কা লয়ে যায়, পনর দিন বাদে বোঝাই নৌকা ল'য়ে ফিরে আসে। আজ দু'মাস যাবৎ এইরূপই চলিতেছে।

আমি। বল কি !

লোকটি। আজ্ঞা হাঁ, এ আমি নিজে দেখেছি। সাধ করে ম'শায় বৈরাগী হ'তে চাই ? সারাদিন খেটে খাবার সংস্থান করিতে পারি না, আর বৈরাগী হলে বিনা আয়াসে বসে বসে খাবার সংস্থান হইবে ; আর দুই তিনটি বৈষ্ণবী যদি রাখা যায়, তা'হলে ত আর ঘর হতে বেরই হ'তে হয় না। তাহারা যদি দু'জনে মাত্র ভিক্ষা করে তা হলেই যথেষ্ট, আর খাবার ভাবনা কর্‌তে হবে না।

আমি। এ ত কম কথা নহে !

লোকটি। আজ্ঞা কম ? সাধ করে কি বলি বৈরাগী হব ?

আমি। তাই ত !

লোকটি। আর ওদের ঘরে জিনিসপত্রই কি কম ? ওদের

ঘরে যে জিনিসপত্র আছে আমাদের অনেকের সেরূপ নাই। ওরা বেশ সুখে আছে; খাওয়া পরার ভাবনা ত নাইই, মাসে মাসে ওরা বেশ দু'চার টাকা জমাও করিয়া থাকে। এখন বলুন দেখি আমাদের মত লোকের বৈরাগী বৈষ্ণবের এ অবস্থা দেখিলে জাত ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বৈরাগী হতে চাওয়া কি অন্যায়?

বাস্তবিক এরূইপই বৈরাগীদের অবস্থা বটে। একটি কথা আছে, "খেটে মরে ছেলে চাষা শুঁড়ির ঘরে লক্ষ্মীর বাসা।" কথাটা এই স্থানেরই উপযুক্ত,এখানেই ইহা ঠিক খাটে। সমাজভুক্ত নিম্নশ্রেণীর সংসারিরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম ক'রে যাহা রোজগার করে,তদ্দ্বারা তাহাদের ভাগ্যে দিনান্তেও একবার আহার করা ভার; কত অশান্তি—কত কষ্ট—কত দুঃখ! আর সুখ হ'ল কি না বৈরাগী বাড়ীতে! কি ভয়ানক কথা! আর তারপর আর এক কথা—ইহারা কিরূপে পাপের পথ প্রসারিত করিয়া দেয়? কি ভয়ঙ্কর প্রলোভন? সংসারের লোককে একরূপ জোর করিয়া টানিয়া বাহির করা, সংসারের একবারে সোজাসোজি সর্ব্বনাশ করা। এই পাপময় দানে প্রতিপালিত লোকদের কর্ত্তৃক কিরূপভাবে প্রলোভিত হইয়া সংসারের লোক কি প্রকারে সংসার ত্যাগ করিয়া ঐ পাপ-সমাজে প্রবেশ করে! সংসারে যাহারা সৎপথে থাকিয়া সৎকর্ম্ম এবং কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে, সুখী তাহারা নয়—সুখ তাহাদের ঘরে নাই। তাহাদের সুখে কোন অধিকার নাই! আর যাহারা চরিত্রহীন আল্‌সে নিষ্কর্ম্মা, আপন জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কোন কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত নহে, সুখ তাহাদের

ঘরে—সুখী তাহারা, সুখের অধিকার তাহাদের। একজন সংসারী যে আপন জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যাহা কিছু করিতে প্রস্তুত, যাহাকে, তাহার জীবনপথে—তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে সামান্য একটু সহানুভূতি দেখাইলে—সামান্য একটু সাহায্য করিলে সে জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে, সমাজ তাহাকে সাহায্য করিতে অপ্রস্তুত; কিন্তু যে চরিত্রহীন, পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে অনিচ্ছুক, যে শুধু ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য ব্যস্ত, সমাজ তাহাকে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া সাহায্য করিতেছে। যে পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত সমাজ তাহাকে সাহায্য করিবে না, আর যে বসিয়া বসিয়া অকারণ অন্ন ধ্বংস করিবে এবং যত প্রকার অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, যত প্রকার আ'ল্‌সের আড্ডা খুলিবে, সমাজ তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। একজন দুঃস্থ দরিদ্র কৃষক একজনের দ্বারে যাইয়া তাহার অভুক্ত পরিবারবর্গের এক সন্ধ্যা অন্নের সংস্থাপনের জন্য একটি টাকা সাহায্য চাইলে সে তথা হইতে নানারূপে নিগৃহীত হইয়া তাড়িত হইতেছে, অন্যদিকে এই সমুদয় অকর্ম্মণ্য চরিত্রহীন লোকদিগকে অকাতরে চিরদিনই অন্যায়রূপ সাহায্য করা হইয়া আসিতেছে। আর, পরিণাম? পাপের প্রস্রবণ দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে। দিন দিনই চরিত্রহীন অকর্ম্মণ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, দলে দলে যাইয়া লোকে পাপসংসর্গে যোগদান করিতেছে। কেন যায়? পাপ জানিয়াও কেন লোকে পাপসংসর্গে যোগদান করে? পেটের দায় বড় দায়, তাই লোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও উদরের জ্বালা নিবৃত্তি,

করিতে একমুঠা খাইয়া বাঁচিতে যায়, লোক যায়,—যদি বসিয়া থাকিলে পেটের খাওয়া চলিয়া যাইবার মত কোন যায়গা পায় তবে যাইবে না কেন? সংসারে সকলেই যে "মরিবে তবুও সংসার ছাড়িবে না" এরূপ ত নয়, যেখানে সুখ পায় লোক সেখানে যায়। দোষ দিবে কার? এইরূপে যাইতেছে—অনেক সংসার উৎসন্ন যাইতেছে —এখন পাপপ্রস্রবণ প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতেছে। আর সমাজ কি করিতেছে? সেই পাপপ্রস্রবণের সহায়তা করিতেছে—দান করিয়া পুণ্য বাড়াইতেছে। হিসাব করিয়া দেখ, লোকে যে টাকা পয়সা প্রতি বৎসর চা'ল ডা'ল ভিক্ষা বলিয়া এই সমুদয় চরিত্রভ্রষ্ট, কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক, অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে অকারণ দিয়া আসিতেছে সেই সমুদয় জমা করিয়া যদি কোন একটী কারবার খুলিয়া দেয়, সচ্চরিত্র সাধু প্রবৃত্তির কত লোক তদ্দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারে। আর পাপের পথও আস্তে আস্তে অপ্রশস্ত হইয়া আসিয়া ক্রমে একবারে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে কি না। যে মুষ্টিভিক্ষা এই সমুদয় পাপের পোষকতা করিয়া থাকে তাহা কুড়াইয়া লইয়া তদ্দ্বারা সমাজের কত উপকার হইতে পারে, কত উন্নতি হইতে পারে এবং সমাজ কি প্রকারে পাপের পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে? দান করিবে ত এরূপভাবে কি দান করা উচিত নয় যদ্দ্বারা দুঃস্থ লোকদিগের রীতিমত স্থায়ীরূপে উপকার হইতে পারে? যদ্দ্বারা সমাজের উপকার হয়? যদ্দ্বারা সমাজ উন্নত হইতে পারে? আর ভিক্ষা দিও না—মুষ্টিভিক্ষাও দিও না, প্রত্যেকে তাহা বন্ধ কর, তাহা জমা কর এবং সকলেরটী একসঙ্গে করিয়া সেই

সমুষ্টির দ্বারা কোন একটী কার্-কারবার কিংবা ব্যবসা কর· এবং তাহাতে যাহারা দুঃস্থ কিন্তু কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত কর, তাহাদিগের স্থায়ী উপকার হইতে থাক্। তাহারা খাইয়া বাঁচুক, তাহাদিগকে তাহা হইলে আর কোন পাপ প্রলোভিত করিতে পারিবে না, ইহাতে সমাজের উপকার হইবে। বৎসর বৎসর দেশে শিল্প বাণিজ্য বাড়িতে থাকিবে, দেশে খাবার হইবে, "হা, অন্ন! হা, অন্ন!" রব আস্তে আস্তে কমিয়া যাইবে। দেশের লোক আবার শান্ত মনে শান্তির গীত গাহিতে পারিবে। আবার বঙ্গগৃহে শান্তিদেবী বিরাজ করিবেন, পুনরায় বঙ্গভবন শান্তিনিকেতনে পরিণত হইবে।

বারবণিতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

আজকাল দেখা যাইতেছে দেশে বারবণিতাদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। কলিকাতা সহরে তাহাদের সংখ্যা ৫০,০০০এর উপরে এবং প্রতি ঘরে যদি দুটী করিয়া টাকাও প্রতি রাত্রে ব্যয় হয়, তাহা হইলেও দিন ১০০,০০০ লক্ষ টাকা এই বেশ্যার দ্বারে অকারণ ব্যয় হইতেছে। তার পর সহর বাজার ত দূরের কথা, সুদূর পল্লীগ্রামে যেখানে সামান্য একটু দুধের বাজার পর্য্যন্ত আছে, সেইখানেই ইহাদের দু'চারজনের বসত আছে এবং প্রতি বৎসরেই দু-একজন করিয়া নূতন নূতন আমদানী হইতেছে। এই সমুদয় আমদানী যে শুধু নিম্নশ্রেণীর সামান্য লোকের ঘর হইতেই হইয়া থাকে তাহা নহে, অনেক সময় দুই চা'র জন ভদ্র

ঘর হইতেও বাহির হইয়া আসিয়া থাকে। অবশ্য অনেক ঘটনা চাপিয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশই কারবারে চলিতে থাকে। ইহাদের দল পুষ্টি আজকাল এরূপভাবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে অতি সত্বর ইহার কোনরূপ প্রতিবিধান না করিলে—এই আমদানীর পথ বন্ধ না করিলে দেশের অবস্থা ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইবে। কেন না, দিন দিনই সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ইহাদ্বারা সমাজের মহা অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে। কারণ ইহাদের প্রাদুর্ভাবে নিম্ন-শ্রেণীর লোকের যেরূপ ক্ষতি হইবার তাহা ত হইতেইছে, আজকাল ইহারা ভদ্র ঘরেরও মাথা খাইতে বসিয়াছে। গ্রাম্য ভদ্রলোকের ছেলেপিলেরা, এমন কি যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই এসব স্থানে পদার্পণ করিয়া আপন আপন উন্নতির পথ চিরতরে অবরোধ করিয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া ভ্যাগাবণ্ড সাজিতে বসিয়াছে, আমি স্বচক্ষে এইরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়াছি। ইহারা যে শুধু আপনার মাথা খায়—তাহা নয়, শুধু যে নিজেদেরই ভবিষ্যৎ নষ্ট করে তা' নয়, ঝোঁকে পড়িয়া সংসার খানি একেবারে শ্মশান করিয়া দেয়। এইরূপ কত হইতেছে—কত সংসার ভস্মীভূত হইতেছে ও হইয়াছে, পাপের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে, পাপিনীদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে, কত টাকা কত পয়সা পতিত জনগণ ইহাদের পায়ে উপহার দিতেছে। অকারণ কত পয়সার অপব্যবহার হইতেছে, কত লক্ষপতি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইতেছে, আর পতিতাদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে।

কিন্তু কেন বাড়ে? কেন এদেশ এমন হইল? কে ইহা-

দিগকে সেই পুণ্যময় সংসার ছাড়িয়া এ পাপ ব্যবসায়ে আসিতে বাধ্য করিল? কে ইহাদিগকে জোর করিয়া হেথায় টানিয়া আনিতেছে? কি কারণ? কেন ইহারা সংসার ত্যাগ করিয়া এখানে আসিতেছে? ইহারা কি সংসার-সুখে সুখী নয়? সংসারের শান্তি কি ইহাদের ভাল লাগে না? সংসারের সুখ কি ইহাদের নিকট ভাল বলিয়া অনুমিত হয় না? সংসার কি ইহাদের ভাল লাগে না? কেন আসিতেছে? কি কারণ? কে ইহাদিগকে সুখময়—শান্তিময় সংসার হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে?

একটী সোসাইটীর রিপোর্টে জানা গিয়াছে এখানকার ইহাদিগের অধিকাংশই ভদ্রঘরের মেয়ে, বিশেষ কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা। কলিকাতার রাস্তায় চলিতে দেখা যায় অনেক কীর্ত্তনওয়ালীর নামের শেষে দেবী শব্দ সংযোজিত আছে। আর দাসীর ত কথাই নাই, ও সব ত প্রায় বাসী মাল। যাক্‌গে, কিন্তু প্রশ্ন এই, এই দেবী কিংবা দাসীদের হিন্দুসংসার হিন্দুঘর হইতে সংসারত্যাগিনী হইয়া বাহির হইয়া আসিবার কি কারণ? এই সব স্ত্রীলোকেরা কেন সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছে? ঐ সোসাইটীরই লোকপ্রমুখাৎ ইহাও শুনা গিয়াছে যে এ সমুদয় পতিতা রমণীরা যাহাদের "সময়" অতিবাহিত হইয়াছে তাহারা অনেকেই যদিও টাকা পয়সায় গহনাগাটীতে কাপড় চোপড়ে দেখা যায় বেশ সুখে আছে এবং তখনও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে নিবৃত্ত হয় নাই, তথাপি তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অনুতপ্ত ও যারপর নাই দুঃখিত। এমন কি শুনা গিয়াছে দু'চার জন তাহাদের দুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে কাঁদিয়া

ফেলিয়াছে এবং ইহাও বলিয়াছে যে তাহাদের যাহা কিছু সমস্তের বিনিময়েও যদি সমাজ তাহাদিগকে পুনঃগ্রহণ করিত, পুনরায় তাহারা যদি সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারিত, আবার যদি তাহারা সংসারী হইতে পারিত, তবে তাহাতে তাহারা প্রস্তুত এবং করিত। ইহাদ্বারা কি বুঝিব? তাহারা কেন আসিল?

সমাজের অবিচার—অন্যায় অত্যাচার।

আমাদের দেশে হিন্দু সমাজের আইনানুযায়ী হিন্দু-ললনাগণ একবার ছাড়া বিবাহ করিতে পারে না এবং সেই বারেও তাহাদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বামী মনোনীত করিবারও তাহাদের অধিকার নাই। অভিভাবক কিংবা অভিভাবিকা যে কেহ থাকে ইহা তাহারই অধিকার। যদিও পূর্ব্বকালে এই অধিকার অভিভাবকদের হাতে থাকায় অনেক উপকার হইয়াছে এবং আজ কা'লও যদি সমাজের অবস্থা সেইরূপ থাকিত, যদিও, বোধ হয় আ'জও উপকার হইতে পারিত, কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী এই অধিকার আর সেরূপ কিছু করিতে পারিতেছে না। কিন্তু তথাপি সেই অধিকারটী এখনও তাহাদেরই হাতে আছে, যাহার বিবাহ তাহার ইহাতে বলিবার কিছু নাই। বিবাহ যথারীতি পূর্ব্ববৎ এখনও অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ইহাতে পাত্র কিংবা পাত্রী কেহ কাহারও রূপাবলোকন করিবার সুযোগ কিংবা সুবিধা পায় না। একের রূপ অন্যের পছন্দ হইবে কি না, একের গুণ কর্ম্ম এবং স্বভাব অন্যের সদৃশ হইবে কিনা, তদ্বিষয়ে কোনও রূপ

বিবেচনা করা হয় না, অভিভাবকদের মনোনীত হইলেই হইল, তাহাদের পছন্দ হইলেই হইল। আর পাত্র পাত্রীর বিবাহের পূর্ব্বে দেখাশুনা হইয়া আলাপ-পরিচয়াদি করত পরস্পর পরস্পরের বিশেষরূপে জানা-শুনা হওয়ার রীতি না থাকায় একে অন্যকে ভালরূপ জানিবার সুবিধা পায় না, কাজে কাজেই একের গুণাবলী অন্যের সহিত মিশ খাইবে কি না তাহাও জানিবার কিংবা বুঝিবার উপায় থাকে না। অভিভাবকগণ তাহাদের সম্বন্ধে মোটামুটি সোজা-সুজি যাহা হয় দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যেটুকু যাহা অবগত হন, তাহাই মাত্র। অভিভাবকদের অভিমত লইয়াই কথা, পাত্র পাত্রীর মতামত কিংবা মিশা না মিশাতে কিছু যায় আসে না। অভিভাবকদিগের মত এবং অনুমতি হইলেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে এবং সাধারণতঃ আজকাল এইরূপেই হইয়া থাকে। বিবাহান্তে যদি ভগবানের কৃপায় একে অন্যের মনোমত হইল, তবে ত সুখের ও সৌভাগ্যের বিষয়, আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেই বেগতিক, তাহা হইলেই সংসারে নানারূপ অশান্তির সূচনা হইতে থাকে এবং দরকার হইলে পুরুষ আবার বিবাহ করিয়া নূতন সংসার পাতিয়া বসে। কিন্তু স্ত্রী কি করিবে? তাহার গতি কি? সে কি করিবে? আর কি করিবে—হয় চিরদিন তুষানলে দগ্ধ হইবে, আর না হয় আত্মবিসর্জ্জন দিয়া জ্বালা জুড়াইবে! কেন না, হিন্দু স্ত্রীরা একের অধিক বার বিবাহ করিতে অক্ষম। তাহাদের ভাগ্যে—যাহা ফলিবার তাহা একবারেই ফলিয়াছে, দ্বিতীয়বার আর ফলাইবার যো নাই!

যাহা হইয়াছে একবার হইয়াছে, আবার হইবার নয়। কিন্তু অন্যদিকে পুরুষ যেমন দেখিবেন বি'য়ের বউ তাঁহার মনোমত হয় নাই, বধূ তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষমা নহে, অথবা সন্তান হইতে বিলম্ব হইতেছে কিংবা সন্তান হইল না, অমনি তখন অন্য বিবাহের যোগাড় করিল, আবার নূতন বধূ ঘরে আসিল। এমন কি, এমনও দেখা গিয়াছে যে ৫০।৬০ বৎসর বয়সেও পুত্র জন্মিল না জন্য, কিংবা তাহার বিষয় ভোগের জন্য কোনরূপ ওয়ারীস রহিতেছে না বলিয়া, সেই বৃদ্ধ বয়সে নবযুবতী ভার্য্যা গ্রহণ করিল। এই ব্যাপার যে এমন কি আজও অতি বিরল, তাহা নহে। বৃদ্ধ বয়সে পুরুষ এখানে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে তাহাতে কোন রকম দোষ নাই, কিন্তু দশ, বার কি পনর বৎসরের বিধবারও আর বিবাহ করিবার অধিকার নাই। সে আজীবন বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিবে, দিনে একবার আতপান্ন সেবন করিবে—নিরামিষাশী হইবে। মাসে দু'টো করিয়া একাদশী করিবে এবং তাহাকে 'ভাগ্যহীনা বলিয়া যে যাহা বলে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা শুনিতে হইবে। একেত যৌবনে যোগিনী, তা'র উপর আবার অন্যায় অকারণ বাক্য-যন্ত্রণা! কত সয়? রক্ত-মাংসের শরীর ত? কত সহিতে পারে? কাহারও বা সয়, এবং সে অতি কষ্টে দাঁত মুখ চিপিয়া কাণে তুলা দিয়া পড়িয়া থাকে, যত প্রকার অত্যাচার বুক পাতিয়া সহিতে থাকে—কুলের মান ও সতীত্বের-মর্য্যাদা বজায় রাখে। আর যাহাদের স'য় না, যাহারা শৈশবে কি বাল্যে সংযম শিক্ষা করিবার সুবিধা পায় নাই, যাহাদের যন্ত্রণার মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া যায় এবং

সেই সময়ে আর কোন প্রলোভনে প্রলোভিতা হইবার সুযোগ পায় কিংবা কেউ আয়েসের পথ দেখাইয়া অথবা কেউ যদি দয়া করিয়া তাহাকে স্বাধীন হইবার যুক্তি দেয়, তবে সে ফাঁসিয়া যায়। আর তা'রপর, সে হয় কাশী, নবদ্বীপ কিংবা নৈহাটী বাসী হয়, আর না হয় কলিকাতায় কিংবা অন্যত্র যাইয়া দেবী দাসীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেয়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই—"এই যে সমাজের এইরূপ ব্যবস্থা ইহার কারণ কি? পুরুষ ৫০ কিংবা ৬০ বৎসর বয়সেও বিপত্নীক হইলে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে, আর একজন নবযুবতী কিংবা আট দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাও যদি বিধবা হয়, তবে সে কেন পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে না? সমাজের এইরূপ বিধানের মানে কি? একজন ষাট্ বৎসরের বৃদ্ধ বিপত্নীক হইয়া পুনরায় দার পরিগ্রহ করত আবার সংসারের সুখ উপভোগ করিতে সক্ষম, আবার তিনি পাকাচুলে কলপ দিয়া প্রণয়ের গান গাহিতে অধিকারী, আর একজন সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী সেই সুখে কেন বঞ্চিতা হইবে? পুরুষের সখ থাকিতে পারে, আর মেয়েদের কি তাহা পারে না? পুরুষের সুখভোগের বাসনা থাকিতে পারে, মেয়েদের কি আর সেই বাসনাগুলি থাকিতে পারে না? পুরুষ যদি পঞ্চাশ বৎসর বয়সে প্রণয়গান গাইতে পারিলেন, তবে স্ত্রীলোক কেন পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাসিনী হইবেন? কি কারণ! পুরুষ এমন কি, পত্নী সত্ত্বেও পরদার গমন করিতে সক্ষম হইবেন, আর স্ত্রীলোক কেন সতের বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া পতির অভাব

সত্ত্বেও পরের কাছে যাইতে পারিবে না? পুরুষের দরকার হইতে পারে, আর স্ত্রীলোকের কি দরকার হইতে পারে না? তাহারা কি জড় পদার্থ? তুমি যা ইচ্ছা তা'ই করিবে, আর তোমরা মরিলেও সে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে কেবল শাক চিবাইবে আর জন্মাবধি কেবল একাদশী করিবে? আর তোমার স্ত্রী মরিয়া যাউক, তুমি তা'রপর দিনই সুযোগ পাইলে বা সুবিধা থাকিলে পাঠা পায়স, কোপ্তা, কোরমা, চপ্‌ ক্যাটলেট মারিতে ছাড়িবে না! ইহার মানে কি?

অনেকে বলিয়া থাকেন, এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে স্ত্রীলোকেরা বেশী পতিপরায়ণা হইবে; এই জন্যই সমাজ তাহাদের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছে। কথাটা মন্দ নয়! যুক্তিটী একবারে চৌকোষ! কেন বাপু! তোমার বেলায়ও সেই ব্যবস্থা কর না কেন? তাহা হইলে তুমিও অধিক পত্নীপরায়ণা হইবে! তুমিও তাহা হইলে আর সোণাগাছী, চিৎপুর দৌড়াদৌড়ি করিবে না। নিজের বেলায় মহাপ্রসাদ আর পরের বেলায় ভাতের কাঁড়ি, কেমন? তাহাদের বেলায় এ'টা পতিভক্তি, আর তোমার বেলায় এ'টা সুখের চরম গতি, কেমন? তুমি যা ইচ্ছা তাই করিবে আর তোমার জন্যে তোমার স্ত্রী সর্ব্বদাই নিমীলিত নেত্রে তোমার ধ্যান করিতে থাকিবে! কেন, তোমার এরূপ বাহার কিসে? এরূপ অন্যায় অত্যাচার কেন? তুমি যা ইচ্ছা তাই করিতে পারিবে, আর তাহারা পারিবে না কেন? তুমি মরে গেলে তোমার স্ত্রী সারাজীবন শাক চিবাইবে, আর সে মরিলে তুমি

তার পরদিনই পাঠা পায়সের বন্দোবস্ত করিবে কেন? আর যদি বাস্তবিকই পতিভক্তি বৃদ্ধির জন্যই হইয়া থাকে, তবে পত্নীভক্তির বৃদ্ধির জন্য হইবে না কেন? এরূপ একচকোমি কেন?

আর তাহাতে কি সমাজের মঙ্গল হইতেছে? তুমি পতিভক্তি বাড়াইবার জন্য তাহাদের প্রতি যত কঠিন আইন জারী করিতেছ, কাশী, নবদ্বীপ, নৈহাটী, বৃন্দাবনে কুমারী এবং প্রবাসিনীর সংখ্যা তত বাড়িয়া যাইতেছে—চিৎপুর, সোণাগাছী, জোড়াসাঁকোতে ঘরের ভাড়া ততই বাড়িয়া যাইতেছে। তার পর তুমি যেমন ডালে উঠিতেছ, তা'রা তেমনি পাতায় পাতায় বিচরণ করিতেছে। ফলে ভ্রূণহত্যার বাড়াবাড়ি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এসব কি পতি-ভক্তি বৃদ্ধির পরিচায়ক? যদি তাহাই না হয়, যদি যাহা হইবার তাহা হইয়াই যাইতেছে, তবে তোমার এ বৃথা ধোঁকার টাটীর বা কিসের দরকার, কিসের জন্য এসব রাখিতেছ? কেন সাম্‌নে পরদা রাখিয়া পেছনে প্রলয় ঘটাইতেছ? কেন সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছ? ইহাতে কি লাভ, কি উপকার, কেন করি-তেছ? কি উদ্দেশ্য? ইহাদ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে? ইহাতে কি পুণ্য হইতেছে? তবে কেন? তোমাদের এইরূপ বিচার বিবেচনায় দেশের কত অপকার হইতেছে জান কি? ভাব কি? ভাবিবার সময় আছে কি? বিবাহের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে, সমাজের সুশৃঙ্খলা চলিয়া যাইতেছে, দিন দিন অকারণ কত ভ্রূণহত্যা—নরহত্যা হইতেছে এবং তোমাদের এই বিধানের ফলে প্রতিদিন কত মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি হইতেছে। কত অর্থের

অপব্যয় হইতেছে, কত সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে, কত অন্যায় অত্যাচার সংসারে চলিতেছে। আর, তুমি কি করিতেছ? বারেক ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নাকে তেল দিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছ, আর জাগ্রতে চিরকণ্ঠস্থ শ্লোক আওড়াইতেছ। কি ভীষণ অত্যাচার! কি ভয়ঙ্কর অবিচার আর কি বিষম হৃদয়হীনতা!

আচ্ছা, সমাজে যে এই সব বিধি-ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সমাজের কি উপকার হইতেছে? কিছু হয় কি? বলিবে স্বেচ্ছাচারিতা যতটা কম থাকে ততই ভাল! বলিবে পাপের পথ বন্ধ করাই উদ্দেশ্য! বলিবে যাহাতে সমাজের লোক সংযমী ও সংযত হয় তাহারই জন্য! কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা হয় কি? তোমাদের সামাজিক নিয়ম ভিতরে ভিতরে—অন্তরে অন্তরে কেহ মানিয়া চলে কি? যদি তাহাই চলিতেছে, আমি বলি যদি তাহাই চলিবে, তবে কাশীর প্রবাসিণীর সংখ্যা এত বাড়ে কেন? কলিকাতায় কিংবা সহর বাজারে বারবণিতাদের সংখ্যা বাড়িবার মানে কি? ইহাতে কি বুঝিব? কি বুঝা উচিত? ইহাদ্বারা কি এই বুঝা উচিত নয় যে, তোমাদের ও শাস্ত্রগুলি সব ধোঁকার টাটী? তবে ছিল এককালে এসব উপকারী, কিন্তু তখন তোমাদের মত তাঁ'রা কেবল শ্লোক আওড়াইতেন না, তাঁহারা শাস্ত্র বুঝিতেন, ভাল করিয়া পড়িতেন, মাথা খাটাইয়া বিচার করিয়া দেখিতেন, দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী কোন্ শাস্ত্র কিরূপ খাটীতে পারে, অথবা তাহাদের ছাট্‌কাট্ দরকার কিনা, দেখিলে এবং তাঁহাদের সাহস ছিল, দরকার হইলে, তখন সময় অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন; শাস্ত্র তখন

নূতন আকার ধারণ করিত। আর তোমরা কি? তোমরা শুধু চর্ব্বিতচর্ব্বণকারী। তোমাদের বিদ্যার দৌড় বেদান্তের পাতা পর্য্যন্ত। তোমরা শুধু শাস্ত্রের পাতা উল্টাও, আর কেবল কণ্ঠস্থ-কর মাত্র এবং শ্রাদ্ধ কিংবা বিবাহসভায় সেই সমস্ত আওড়াইয়া দু'টো পয়সা পাওয়ার ব্যবস্থা কর। আর যদি খুঁত পাও, তবে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়া আটগণ্ডা পয়সা রোজগার করিতে ছাড় না। তোমাদের পড়াশুনা এই জন্য। শাস্ত্র তোমরা পড়ার জন্যও পড় না, সমাজের মঙ্গলের জন্যও পড় না; শাস্ত্রীয়বিষয়গুলি তোমরা দেখ না, এবং সেগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিবারও ক্ষমতা তোমাদের নাই; অথবা সময় অনুযায়ী শাস্ত্র খাটাইবার সাহসও তোমাদের নাই; আছে কেবল দুঃস্থ দরিদ্রদিগকে নিপীড়ন করিবার ক্ষমতা, আর শ্রাদ্ধসভায় গীতা পাঠের অধিকার, আর দুই একটা শ্লোক ঝাড়িবার! কিন্তু পুরাণ খাতার কোণের সূতা ছাড়িবে না। এসব কি সমাজের প্রতি অন্যায় অত্যাচার নহে? এসব কি ন্যায়? আর, এসব কি সত্য? না কি এর কোন ভিত্তি আছে? কিছুই নয়। তবে ইহাকে ধোকায়কাটী বলিব না কেন? ধোকার টাটীও ঠিক বৃথা কারণে দণ্ডায়মান থাকে, আ'জকাল তোমাদেরও ঠিক তাই। তা'ই বলি এসব ছাড়িয়া দাও, সমাজের লোক মুক্তভাবে এবং মুক্ত প্রাণে দেশের, দশের এবং সমাজের উন্নতি করিতে অগ্রসর হউক—দেশের লোকগুলি বেঁচে থা'ক। দেশের অর্থের অপব্যয় না হইয়া সেগুলি সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হো'ক। এসব কুসংস্কার দূর না হইলে, লোকে স্বাধীনতা না পাইলে, আবার

সত্য কথা বলিতে না শিখিলে, দেশ কখনও উন্নত হইতে পারিবে না।

আর এক কথা। অধঃপতন হইলেই লোকের নানারূপ অবস্থা হইয়া থাকে তখন আর তাহাদের সত্যাসত্য—ন্যায় অন্যায়—মঙ্গলামঙ্গলের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না, যখন যা' ইচ্ছা তা'ই করিতে পারে। অনেক সময় আপনার পায় আপনিই কুড়াল মারিয়া থাকে। আ'জ কা'ল দেশে অভাবটী বড় বেশী—পয়সার জন্য লোক পাগল; করাণ, বিদেশী সভ্যতা দিন দিন দেশী লোকের খরচ বাড়াইয়া দিতেছে, কিন্তু এদিকে আয়ের অঙ্ক যেমন তেমনই আছে; তা'র একটু এদিক কি ওদিক হয় নাই, যেমন ঠিক তেমনই আছে। কিন্তু খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় উপস্থিত আয়ের উপর তাহাদের যতটা দরকার তাহার জন্য লোকে যা ইচ্ছা তাই করিতেছে।—এক পয়সার জন্য আশীটা মিথ্যা কথা বলিতেছে। অন্যদিকে আবার এক হাত যায়গার জন্য মারামারী কাটাকাটী করিয়া শেষে আবার ধার করিয়া কোর্টে টাকা ঢালিতেছে। পরশ্রীকাতরতাকে প্রতিযোগিতা বলিয়া ধরিয়া লইতেছে, পয়সা পাইতে গিয়া নিজের অজ্ঞাতে আপন পায়ে কুড়াল মারিতেছে। হিংসা দ্বেষ লোকের দিন দিন এতই বাড়িয়া যাইতেছে যে, পিতাপুত্রে সাংঘাতিক বনাইতেছে। এদেশে আজকাল পিতাও পুত্রকে বিশ্বাস করিতে পারে না। লোকের এমনই অধঃপতন হইয়াছে যে, সত্যের ভিত্তিটা যেন একবারেই উল্‌টাইয়া দিয়াছে। আজকাল দেশী ধনী লোকেরা কারবারে টাকা দিতে সাহস করে

না; মানে তাহারা ভয় পায়, তাঁহাদের ঘরের টাকা না পর হইয়া যায়—লাভ ত দূরের কথা, পাছে তাহারা মূলধন না হারাইয়া বসে। তাহাদের ভয় যে নিতান্ত অমূলক তাহা নহে, আজকাল এরূপ অনেক হইতেছে। অনেকে কারবার করিয়া লাভ করিবে বলিয়া ধনীর নিকট হইতে টাকা লইয়া শেষে তাহাকে রম্ভা দেখাইয়া বিদায় হইতেছে, অথবা সারশূন্য খোলস কেবল ধনীকে বুঝাইয়া দিয়া নিজেরা সার লইয়া সরিয়া যাইতেছে। কথাটা আর একটু খুলিয়া বলা দরকার। ধনীকে লাভের আশা দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে মূলধন লইয়া কোনরূপ ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা কার কারবার খুলিয়া বসিল। ব্যবসায় প্রথম প্রথম বেশ লাভও হইল এবং তাহার ফলে ধনী আরও কিছু টাকা বাহির করিলেন; কিন্তু তখন ব্যবসায়ী ম্যানেজার আপনার পকেট পূরিবার চেষ্টা পাইলেন—তিনি চুরী আরম্ভ করিলেন এবং কারবারটীকে খোলা থাপড়া করিয়া পলাইতে প্রয়াস পাইলেন। ধনী তখন হাত দিয়া দেখিলেন কেবল খোলসটী মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। আর যদি তাহাও না হয় তবে ম্যানেজার অথবা কর্ম্মকর্ত্তা এমন কিছু করিয়াছেন যাহাতে ধনীকে "ছেড়েদে মা কেঁদে বাঁচি" বলিয়া সে কারবারের ফাঁদ হইতে পলাইবার চেষ্টা পাইতে হইল। বিষয়টা এরূপই বটে! এই সব যে কেবল অশিক্ষিত লোক দ্বারাই হইতেছে তাহা নয়, সুশিক্ষিত সুসভ্য স্বদেশী নেতাদিগেরও দু'চার' জন যে এরূপ কার্য্য করেন নাই বা এখনও করেন না, এরূপ নহে। কাজে কাজেই এখন আর ধনীরা ব্যবসার জন্য

আমাদিগকে টাকা দিতে চায় না। তবে যে দু'এক জনে আ'জ কা'লও দেয় সে নেহাৎ ঠেকিয়া পড়িয়া। সে টাকা যে আর সে ফিরিয়া পাইবে না ইহা সে জানে এবং জানিয়া শুনিয়াও ঠেকিয়া পড়িয়া দিয়া থাকে।

আর একটী বড় আশ্চর্য্যের কথা। আ'জ কা'ল স্বদেশীর নাম করিলে লোক নাক সিঁট্‌কাইয়া থাকে এবং তাহাতে সব রকম অবিশ্বাসের কারণ দেখাইয়া দেয়। স্বদেশী কিছু করিব বলিলেই লোকে অমনি মনে করে কোন একটা বিশেষ রকম জুয়োচ্চোরীর মতলব। যদিও বা কোন কারবারে কাহারও ইচ্ছা থাকে কিন্তু স্বদেশীর নাম শুনিলে তাহার একবারে মুখ শুকাইয়া যায়। কি অন্যায় কথা! আট নয় বৎসর পূর্ব্বে যে স্বদেশীর নাম করিলে লোকে আনন্দে আত্মহারা হইত, আ'জ সেই স্বদেশীর নাম করিলে তাহারা একদম নাক সিঁট্‌কাইয়া উঠে। কি দুঃখের কথা! কি পরিতাপের বিষয়! কিন্তু কি কারণ? স্বদেশীর প্রতি লোকের এরূপ অবিশ্বাস হইবার কারণ কি? যে স্বদেশীর জন্য লোকে কত কি করিতে রাজি হইত, আ'জ সেই স্বদেশীর নাম শুনিবামাত্র নাক্ সিঁট্‌কায়! ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? কিন্তু কেন এরূপ করে? কিসে এরূপ হ'লো? কেন লোকে আ'জ এরূপ করে! স্বদেশী পাণ্ডাগণ স্বদেশীর নাম করিয়া টাকা সংগ্রহ করত স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য কিছু না করিয়া আপন আপন সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা পাইলেন, স্বদেশীর নাম করিয়া যে সব টাকা পয়সা সংগ্রহ করিলেন তাহা আপন পকেটে পূরিলেন,

অথবা তদ্দ্বারা নিজে নিজের নামে কারবার করিয়া বসিলেন, স্বদেশী স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে বাধ্য হইল।

তার পর আরও একটী কথা বলিবার আছে। আ'জ কালও এদেশে লোকে যৌথ কারবারে টাকা দিতে চায় না। লিমিটেড কোম্পানীর সেয়ার কিনিতে একেবারে অনিচ্ছুক। লোকে টাকার অপব্যয় করিবে তবুও লিমিটেড্ কোম্পানীর সেয়ার কিনিবে না। কি অন্যায় কথা! বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সমুদয় সভ্য দেশেই এই প্রণালীতেই কারবার হইয়া থাকে। সে সব দেশে এখন আর একজন লোকে কারবার করে না। তথায় প্রায় সর্ব্বত্রই কারবার করিতে হইলে দশজনে মিলিয়া কোন একটা কিছু করে। আর এই দেশে যৌথ কারবারের নাম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠে। কারণ কি? আর কিছুই নহে, জুয়াচুরি। কয়েক জন ভদ্রবেশী চোর মিলিয়া একটা কিছু আরম্ভ করিলেন, নিজেদেরই কয়েক জন লইয়া বোর্ড অফ ডিরেক্টারস্ গঠিত হইল। ইহার ভিতরে যিনি পাকা চোর তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হইলেন। ঐ কোম্পানিটী গভর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রী আফিসে রেজিষ্ট্রী হইল। ডাইরেক্টরস্‌গণ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেয়ার বিক্রয় করিতে লাগিলেন। সেয়ার বিক্রী হইল, কাজ কর্ম্ম চলিতে লাগিল; কোম্পানীর ক্যাশে বেশ টাকা আসিতে লাগিল। কিন্তু কোম্পানীর কর্ণধারগণ যখন দেখিলেন তহবিলে অনেক টাকা জমিয়াছে, তখন তাঁহারা আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় দেখিতে লাগিলেন। অতি অল্প দিনের ভিতর কোম্পানিটী লিকুইডেশনে গেল। আর যাহারা কোম্পা-

নীর সেয়ার কিনিয়াছিলেন তাঁহারা সব রামরম্ভা দেখিলেন। ব্যাপার এই রূপই বটে এবং এই জন্যই যৌথ বা লিমিটেড্ কোম্পানীর সেয়ার কেহ কিনিতে চায় না। যৌথ কারবারের কথা শুনিলে লোকে ভয় পায় এবং যাহারা এই কারবার আরম্ভ করে তাহাদিগকে জুয়াচোর ব্যতীত অন্য কিছু মনে করে না। বর্ত্তমানে এইখানে এই সব কারবারের সম্বন্ধে খবর এই রূপই বটে! দুনিয়াতে কে প্রতারিত হইতে চায়? কে বাক্‌সের টাকা জলে ফেলিতে রাজী হয়? লোকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে টাকা উপায় করে, তাহা অকারণ কেহ জলে ফেলিতে চায় কি? না জুয়াচোরের হাতে অর্পণ করিতে চাহে? কারবারে টাকা দিতে হইলেই লোকে প্রথমে সেই কারবারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করে, তাহার পর লাভালাভ অথবা লাভালাভের পরেই স্থায়িত্ব। এ সব বিষয়ে যদি তাহারা আশানুরূপ উত্তর না পায়, তবে তাহারা কেন টাকা দিবে? আর বিশেষ, যদি জানে যে ইহাতে যে টাকা দেওয়া যাইবে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, তবে কি আর টাকা দেয়? দেয় না, আজ কাল দিতেছেও না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এযাবৎ কেবল দু' চা'রটী যায়গায় ছাড়া আমাদের এখানে যৌথকারবারে কাহাকেও কৃতকার্য্য হইতে দেখা যায় নাই। এই দুই চারিটী ছাড়া এ পর্য্যন্ত যতগুলি কারবার আরম্ভ হইয়াছে তাহারা অকালেই অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। লোকে এই ব্যাপারে ভয় করিবে না কেন? কাজে কাজেই ভয় করে। এ সমুদয়ের কারণ কি? আমাদের সত্যের উপর

নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই—ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা অবিশ্বাসী; দশজন যাহা বিশ্বাস করিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, আমরা যাহা বিশেষরূপ বলিয়া কহিয়া লইয়া আসিয়াছি, তাহা যখনই আমাদের শাসনাধীনে—কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়িয়াছে, তখনই আমরা আত্মসাৎ করিয়াছি, বিশ্বাসের মর্য্যাদার দিকে আর দৃক্‌পাতও করি নাই, অবাধে—অকুণ্ঠিতচিত্তে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। লোকে কেন আমাদের বিশ্বাস করিবে? আমরা আ'জ আমাদের মনুষ্য-উপযোগী সদ্‌বৃত্তি সমুদয় হারাইয়া ফেলিয়াছি, সে সব গুলিকে মরিচা ধরাইয়া দিয়াছি, মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি; যে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে আমরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হই না। লোকে কেন আর আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে? সাধারণ লোকের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর আজ কাল একটা ঘৃণার ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সে ঘৃণার কারণ আর কিছুই নহে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতা। আর আমাদের এ সব চরিত্রগত দোষের মূলে কি শৈশবে মায়ের কোলে সৎশিক্ষার অভাব, বাল্যেতে বাপের নিকটে সত্য কথা বলাইবার চেষ্টার অভাব, ভ্রাতৃ-সমীপে ভদ্র ব্যবহারের অপ্রতুলতা, আর সহচরদিগের নিকটে দয়ার দরিদ্রতা এবং প্রতিবেশীদিগের নিকটে কার্য্যক্ষমতার পরিচয়ের অভাব নয়? আর বন্ধুবর্গের নিকটে বিশ্বাসের বিপত্তি নয়? আমরা শৈশবে কি বাল্যে অথবা যৌবনের প্রারম্ভে, যখন শিক্ষার সময়, তখন আমরা সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হই নাই, যখন চরিত্র গঠনের

সময় তখন সৎদৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া আপন চরিত্র গঠন করি নাই, যখন কার্য্যশিক্ষার সময় তখন যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য শিক্ষা করি নাই, কার্য্যক্ষম হই নাই; সুতরাং কর্ম্মজীবনে কাজ না করিয়া কেবল ফাঁকতালে ফাঁকি দিয়া বড়মানুষ হইতে চাহি। আর তাহারই ফল এই সব; এত বড় স্বদেশী আন্দোলন একবারে "কিছু না"তে মিশিয়া গেল। অতি সামান্য ক্রটীতে অসামান্য সসাগরা সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে পারে তাহা অবিশ্বাস করা যায় না। আমরা যখন নিজের নিজের স্বতন্ত্র জীবন বহন ও যাপন করিতে থাকি, তখন আমাদের চরিত্রের সামান্য একটু ক্রটী বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ না হইলেও না হইতে পারে; কিন্তু যখনই আমরা আমাদিগকে কোন একটা বড় বাহিনীর সঙ্গে জুড়িয়া দিই, তখন আমাদের চরিত্রে সেই সামান্য ক্রটীটুকু যে কোন সময়ে সেই বিপুল বাহিনীর অথবা বিরাট্ ব্যাপারের মহা অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! এত বড় স্বদেশী ব্যাপারের এরূপ অধঃপতনের কারণ কি? আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা নয় কি? নেতৃবর্গের চরিত্রহীনতার ফল নয় কি? তাঁহাদের অপরিণামদর্শিতার ফল নয় কি? যে স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠায় একদিন এমন কি দরিদ্র বিধবারা পর্য্যন্ত তাহাদের অতি সামান্য সম্বল—সামান্য চুড়ি বালা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া স্বদেশী কারবারের সেয়ার কিনিত, আজ সেই স্বদেশীর কথামাত্র শুনিলে—যৌথ ব্যাপারের নাম মাত্র শুনিলে লোকে পিছাইয়া যায় কেন? ইহা আমাদের বিশ্বাস-

ঘাতকতা, চরিত্রহীনতা, অপরিণামদর্শিতা এবং অনুপযুক্ততার ফল নয় কি? ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি কতকগুলি চরিত্রহীন বিশ্বাসঘাতক আসিয়া এখানে না জুটিত যদি আমরা উপযুক্ত হইতাম, তবে কি ঐ অত বড় স্বদেশী আন্দোলন এইরূপে অবশেষ হইত? স্বদেশী আন্দোলন তাহা হইলে আজ আমাদিগকে কতদূর অগ্রসর করাইয়া দিতে পারিত। স্বার্থপর আমরা, নীচ স্বার্থের জন্য মূল বিষয়ের মূল কর্ত্তন করিলাম। যাহা ধরিয়া থাকিয়া চিরদিন স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারিতাম, চিরদিন প্রতিপালিত হইতে পারিতাম, নিচস্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া বসিলাম। আমাদের ব্যাপারই এইরূপ, আমাদের চরিত্রই এইরূপ; ইহা আমাদের সামান্য সামান্য কার্য্যেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি কাহারও সহিত আমরা ভাগে কার কারবার করিতে যাই, আমরা তাহার বিনাশ করিয়া ছাড়িয়া দিই। আমরা যদি এক আফিসে দু'জনে চাকরী করিতে যাই, অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজে বড় হইতে যাই। যদি একখানে দু'টী কারবার হইতে আরম্ভ হয়, একটীর উচ্ছেদ করিয়া অন্যটী বড় হইতে চায়; প্রতিযোগিতা নয়, এ'টী প্রতিহিংসা। একজনের বিনাশ সাধন করিয়া আমি বড় হইব, প্রতিযোগিতা ঠিক তাহা নহে। সে যত বড় হইয়াছে ইহাপেক্ষা আমি অধিক বড় হইব ইহাকেই প্রতিযোগিতা বলে। প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীকে বিনাশ করে না, একবারে মারিয়া ফেলে না; কেন না, তাহা করিলে সে কাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে? কিন্তু প্রতিহিংসকেরা একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া—তাহাকে

সমূলে বিনাশ করিয়া অন্য জনে বড় হইবে ইহাই তাহাদের চিন্তা, এবং করেও তা'ই। কিন্তু সেটা প্রতিযোগিতা নয়, প্রতিহিংসা। আমরা প্রতিযোগিতা জানি না, প্রতিযোগিতা করিও না। জানি প্রতিহিংসা এবং প্রতিযোগিতার নাম দিয়া করিও ঠিক তা'ই। পুণ্যের নাম দিয়া পাপ করিতেছি, যেমন বিশ্বাসের ধুঁয়া ধরিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছি, তেমনি প্রতিযোগিতার নাম দিয়া প্রতি-হিংসা করিতেছি। আমাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতাই নাই। নীচ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থের ক্ষমতা বেশ আছে এবং করি-তেছিও তা'ই। ন্যায়ের প্রতি—সত্যের প্রতি আমাদের ভক্তি নাই, অন্যায় রূপে অসত্য কহিয়া একজনের সর্ব্বনাশ করিতে আমরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইনা। আমাদের হৃদয়ের বৃত্তিগুলিই যেন সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের হৃদয়ের বৃত্তিগুলি অনেক দিন হইতেই সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, যতই তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষিত হইতেছি. ততই আমাদের দিনের দিন অধঃপতন হইতেছে। ইহার কারণ কি? এ যে শুধু সহরে বাজারে তা নয়, মফঃস্বলে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে—সেখানে যেন আরও বেশী। লোকে তথায় একটী পয়সার জন্য এমন সব পেশা অবলম্বন করিতে পারে যে তাহা আর বলিবার নয়; এক হাত জমির জন্য তথায় লাঠালাঠী মারামারী হইতেছে। সুতরাং ইহা সর্ব্বত্রই এইরূপ। হিংসা দ্বেষটা দেশের পল্লীগ্রামে অতিশয় বেশী, কিন্তু এ সবগুলির কারণ কি? সমাজে সৎশিক্ষার অভাবই নয় কি? সমাজের নেতৃবর্গের অনুপযুক্ততার

ফল নয় কি? অপরিণামদর্শিতার ফল নয় কি? এ সমস্ত অধঃপতনের মূলে আমাদের সমাজে শিক্ষার অভাব নয় কি? অন্য সমাজে সুশিক্ষা দেয় সত্য কহা শিক্ষা, আর আমাদের সমাজে আমরা কুশিক্ষা পাইয়া অসত্য বলিতে আরম্ভ করি। আমাদের সমাজে সদৃষ্টান্তের বর্ত্তমানে একান্ত অভাব, কাজে কাজেই আমরা সম্মুখে যে অসদৃষ্টান্ত দেখিতে পাই তাহারই অনুসরণ করিতে থাকি। আমাদের সত্যরূপ ভিত্তি নাই। আমরা সত্য কথা কহিতে শিখি না, সৎসাহসও আমাদের হৃদয়কে পরিচালিত করিতে পারে না। আমরা আ'জ অধঃপতিত অধম অমানুষ "ও বাঙ্গালী"। আমরা কোন কর্ম্মেরই অধিকারী নই; এখানে আমাদের কোনকাজেরই অধিকার নাই। কিন্তু আমাদের মুক্তি কিসে? যদি আমরা কর্ম্মের উপযুক্ত না হই, কর্ম্ম করিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে আমাদের ইহকাল পরকাল উভয়েই যে সমান। কারণ, ইহলোক দিয়া ত পরলোক! এ'টা যে কর্ম্মক্ষেত্র।

কর্ম্মক্ষেত্র।

এখানে এটা যে বাস্তবিকই কর্ম্মক্ষেত্র। "দুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছি, আবার দুই দিন পরেই এখান হইতে চলিয়া যাইব। এখানকার যাহা কিছু সবই এখানে পড়িয়া রহিবে কিছুই সঙ্গে যাইবে না; এ সংসার মিথ্যা মায়ার বাঁধন মাত্র, বাস্তবিকই কিছু নয়। এই দেহ যাহা এত যত্নে বৰ্দ্ধিত এবং প্রতিপালিত হইতেছে ইহা পড়িয়া রহিবে, আত্মা জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করত

নূতন বস্ত্র পরিধানের ন্যায় এই দেহ পরিত্যাগ করত অন্য আর একটী নূতন দেহ ধারণ করিবে; এ প্রাণশূন্য পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চ ভূতে মিশিয়া যাইবে। এইত পরিণাম! তবে ইহা এমন কি?—ইহার জন্য কি? এ নশ্বর জীবন ও নশ্বর সংসার এ সব কিছুই নয়, কেবল মায়া; ইহা কিছুই নয়, দুই দিনের জন্য মাত্র। এখানে আমি কোনক্রমে দুই চারিটী দিন মাত্র কাটাইতে পারিলেই হইল।" বর্ত্তমানে অনেক অপরিণামদর্শী পণ্ডিতদের এইরূপ যুক্তিতেই আমাদিগকে পতনের দ্বারে উপনীত করিয়াছে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল চাই, যদি দেশের উন্নতি আমাদের বাঞ্ছনীয় হয়, তবে এই পতনপথ-প্রদর্শক অন্যায় যুক্তিযুথকে এই যুগে অবিরাম গতিতে চলিতে দেওয়া কর্ম্মবীরগণের উচিত নয়। এ সংসার কিছু নয় বলিয়া আর ঘুমাইতে দিলে চলিবে না, ইহা কিছু নয় বলিলে চলিবে না। যদি কিছু করিবার থাকে, যদি কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, যদি দেশের মঙ্গল বাঞ্ছনীয় হয়, যদি আমরা দেশের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি, তবে বলিতে হইবে এবং ঘোষণা করিতে হইবে, দেশের সকলকে বুঝাইতে হইবে এ'টা কর্ম্মভূমি—স্বীকার করাইতে হইবে এ'টি কর্ম্ম ক্ষেত্র।

অবশ্য, বলা বাহুল্য, দুই চারিদিনের জন্যই আমরা এই সংসারে আসিয়াছি এবং দুই চারি দিন পরেই এই সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে। সত্য কথা, এ দেহ নশ্বর এবং আমাদের আত্মা জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করার

ন্যায় এ পুরাতন দেহখানি পরিত্যাগ করত একটী নূতন দেহ-ধারণ করিবে এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে এ সংসার কেবল মাত্র মায়ার খেলা ও মায়ার বন্ধন; ইহা প্রকৃত পক্ষে কিছু নয়। কিন্তু কথা এই যে পর্য্যন্ত ইহা সামান্য "কিছু" বলিয়াও স্বীকার করা যায়, সে পর্য্যন্ত কিরূপে সেই "কিছুকেই" কিছু নয় বলিয়া একেবারে অস্বীকার করা যায়? মায়াময় হোক কিংবা অতি অকিঞ্চিৎকর যাহাই কিছু হো'ক, দু'দিনের জন্য হো'ক, আর দু'বৎসর কিংবা দু'যুগের জন্য হো'ক, তাহাতে কিছুই যায় আসে না; কিন্তু এ'টা যে "কিছু" তাহা আর অস্বীকার করিবার যো নাই, ইহা স্বীকৃত। কেন না, যদি ইহা "কিছু" তবে আবার "কিছু" নয় কিরূপে? যাহা 'কিছু" তবে আবার "কিছু নয়" ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং যখন ইহা "কিছু" বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তখন ইহা যে "কিছু" ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহা স্বীকার্য্য ও নিশ্চিত।

কিন্তু এই "কিছু" কি? এই সংসার—এই পৃথিবী যাহাতে আমরা অন্ততঃ কতক সময়ের জন্য ও বাস বা প্রবাস করিতে আসিয়াছি ইহা কি? আমাদের পক্ষে ইহার আবশ্যকতা কি কিছুই নাই? যে তা'ই আমরা ইহা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিই? তবে কি এখানে আসা যাওয়া কেবল মিছা ভূতের বেগার খাটা? আমাদের পক্ষে কি ইহার কোন আবশ্যকতা নাই? ইহা কি আমাদের কোন উপকারে আসে না? তবে কি এখানে এ বৃথা আসা যাওয়া? যদি কোন আবশ্যকতা না থাকে, যদি এখানে

আসার কোন উপকারিতা না থাকে, যদি এখানে আসার কোনই অর্থ না থাকে, তবে এ বৃথা আসা যাওয়া কেন? ঈশ্বর কেন এ আসা যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন? তাঁ'র কি এ ব্যবস্থার কোন অর্থ নাই? তিনি কি অনর্থক কাজ করেন? এ'ও কি কখন সম্ভব? তাহা কখনই সম্ভব নয়। তাঁহার ব্যবস্থা, তাঁহার বিধান, তাঁহার কার্য্য কিছুই অনর্থক হইতে পারে না। এই জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহার কিছুই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই; আর যদি তাহাই ঠিক, তবে এখানে আসা যাওয়ার ব্যবস্থা ও অনর্থক হইতে পারে না। এই আসা যাওয়ারও অর্থ কিছু আছে, আর এই মায়াময় দুনিয়াকেও চো'ক বুজিয়া নাই বলিলে চলিবে না। সুতরাং এ'টা কিছু। কিন্তু ইহা কি? আমাদের পক্ষে ইহার আবশ্যকতা কি? আমরা কিরূপে ইহা উপভোগে অথবা ব্যবহারে আনিয়া থাকি? ইহা আমাদের কি উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে? কেন এই দুনিয়ার সৃষ্টি? আর কেনই বা আমরা এখানে আসিয়া থাকি? কেনই বা আমাদের এ মিছা মায়ার বন্ধন গ্রহণ? কেনই বা আমাদের এখানে আগমন?

এ দেহটা যে নশ্বর ইহা ঠিক, কেন না ইহার বিনাশ বা পরিবর্ত্তন আছে। যাহা বিনাশ বা পরিবর্ত্তনশীল তাহাই নশ্বর। এ দেহেরও বিনাশ আছে, এ দেহেরও আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য কিছুতে পরিণত হইয়া যায়; সুতরাং ইহাও নশ্বর। কিন্তু তা'ই বলিয়া এ'টা কিছু নয় ইহা কি স্বীকার করিতে পারি? কি করিয়া ইহা স্বীকার করিব? ইহা স্বীকার করিতে পারি না। দেখিতে

পাই, বুঝিতে পাই, এই দেহ দ্বারাই আমার প্রকাশ। এ দেহই আমার প্রধান কর্ম্মময় জীবনের আশ্রয় এবং অবলম্বন। ইহারই সাহায্যে আমি আমার গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাইতে সক্ষম। এক কথায় ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে আমি আমার কোন কর্ম্ম সম্পাদনে অসমর্থ। ইহা আমার কর্ম্মের তরি, কর্ম্ম সম্পাদনের একমাত্র সহায়, এবং কর্ম্ম সম্পাদনে প্রধান আশ্রয়। ইহা আমারই অন্তরূপ, ইহা ছাড়া আমি অপ্রকাশ! এ হেন যে দেহ কেবল মাত্র যাহা দ্বারা আমি আমার যত কর্ত্তব্য তাহা প্রতিপালন এবং যত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকি, যদ্দারা আমিদের আমিত্বের অনুভব করা যায়, সেই দেহটীকে কিছু নয় বলিয়া কি করিয়া স্বীকার করিতে পারি? এই আমার কর্ম্মাবলম্বন, এই আমার কর্ম্মের আশ্রয়, ইহাকে কিছু নয় বলিয়া কি করিয়া স্বীকার করিতে পারি?

তা'রপর, অবশ্য অনন্তকালের সঙ্গে তুলনায় পঞ্চাশ ষাট কিংবা সত্তর বৎসর সময় দুই চারি দিনেরই মত বটে, আর এই সীমাবদ্ধ সময়ই মাত্র আমাদের এই সংসারে অবস্থিতির সময়। এই অল্পমাত্র সময়ের জন্যেই আমরা এখানে আসিয়াছি এবং এই সময়ের পরই আমাদিগকে এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, এই যতটা সময়ের জন্যে আমরা এখানে আসিয়া থাকি, অথবা যতটা সময়ই এখানে থাকি, এই সময়-টা'র জন্য কেন আমরা এখানে প্রেরিত হইলাম?—কেন আমরা এখানে আসিলাম? কেবলই কি মিছামিছি দিনগুলি যেমন তেমন করিয়া কাটাইয়া দেওয়ার জন্য? কেবল কি আসা যাওয়ার জন্য

এখানে আসিয়াছি? কেবল কি দিন গুজরানই একমাত্র কাজ? অথবা আর কিছু করিবার জন্য? কিংবা কোন উদ্দেশ্য আছে?

কি উদ্দেশ্য?

জীবনের উদ্দেশ্য কি? কেন লোক পৃথিবীতে আইসে? কেন লোক এখানে আসিয়া কালযাপন করে? কি উদ্দেশ্য? কেবলই কি কতকটা সময় কাটানর জন্য? কেবল কতকটা সময় কাটানের জন্য আত্মা কখন অবনীতে অবতীর্ণ হইতে পারে না। কেন না, যদি তাহাই হইতে পারিত তাহা হইলে, এখানে একবারে না আসিলেও চলিতে পারিত এবং তাহাতে তেমন কোনই ক্ষতির কারণ ছিল না বা হইত না। কারণ উদ্দেশ্যবিহীন আসা যাওয়া অপেক্ষা, একেবারে না আসা বরং ভাল। বেকার আসায় কোনই লাভ নাই, না আসিলে কোনই ক্ষতি বা দোষ যে আছে এরূপ মনে হয় না। এখানে যখন আসিয়াছে, অবশ্য কোন উদ্দেশ্য আছে। আত্মার এখানে আবির্ভাব হওয়াটাই বলিয়া দিতেছে যে কেবল দিন কাটান ছাড়াও এই জীবনটার আরও কোন উদ্দেশ্য আছে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই আত্মা এখানে সমাগত। এ আসা যাওয়ার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কি?

প্রত্যেকটী প্রাণীর জীবনের প্রারম্ভ হইতে দেখা যায় যে, সকলেই সেই প্রথমাবস্থা হইতেই কর্ম্মে নিযুক্ত। জ্ঞানতঃ হো'ক আর অজ্ঞানতঃ হো'ক, সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত,—সকলেই কোন না কোন একটা কর্ম্মে নিযুক্ত। কু কি সু, সৎ কি অসৎ, ন্যায় কি

অন্যায়, সঙ্গত কি অসঙ্গত, সে সমুদয় এখন বিচার্য্য বা বিবেচ্য নয়। কিন্তু সকলেই যে কাজ করিতেছে এবং কাজে ব্যস্ত ইহা ঠিক, ইহাতে কোন ভুল নাই। কিন্তু ইহা হইতে কি বুঝিব? ইহাদ্বারা এই বুঝিতে পারি এবং ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, জীবাত্মার প্রাকৃতিক গতি অথবা প্রকৃতিই কর্ম্ম করা। কিন্তু আত্মার এই প্রকৃতি হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি? আত্মার কি উদ্দেশ্য? এই কেবল কর্ম্মসম্পাদন করাই কি ইহার উদ্দেশ্য? যদি তাহাই তাহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পুনরায় প্রশ্ন,—এই কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি?

আত্ম প্রকাশই আত্মার একমাত্র উদ্দেশ্য। আত্মার সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, এখানে আগমন ও অবস্থানুযায়ী আকার বা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন এবং তৎপর আবার অবস্থাভেদে বাসনার বশবর্ত্তী হন ও তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকেন এবং বাসনা চরিতার্থের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে থাকেন। জ্ঞানতঃ আর অজ্ঞানতঃ হো'ক, আত্মা এইরূপে চলিতেই থাকে। প্রত্যেক বাসনাই, আত্মাকে নূতন আকারে—নূতনরূপে—নূতন সাজে সাজাইয়া দেয়। আর আত্মা কর্ম্মের ঘোরে বাসনা চরিতার্থ করিয়া প্রতিবারেই আত্মশক্তি অনুভব করিতে থাকে এবং শেষে গৃহীত আকার বা রূপ পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন বাসনানুযায়ী নূতন আকার ধারণ করিয়া নূতন রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ধাবিত হয়। এইরূপে আত্মা অবিরামগতিতে দিনের পর দিন, জীবনের পর জীবন, জন্মের পর জন্ম, এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে থাকে। প্রত্যেকটী জন্ম এক

একটী অভিজ্ঞতার সোপান ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই অভিজ্ঞতা লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। প্রত্যেকেই জ্ঞানতঃ হো'ক আর অজ্ঞানতঃ হো'ক বাসনানুযায়ী কর্ম্মবিনিময়ে এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ব্যস্ত, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এই। এই কারণে এই কয়দিনের জন্ত এই একখানি দেহের সাহায্য লইয়া আমরা এই সংসারে আসিয়া থাকি এবং কর্ম্ম সম্পাদনে ব্যস্ত হই। এই কর্ম্মই আমাদের একমাত্র উপায় এবং এই নশ্বর পঞ্চভৌতিক দেহই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ইহার সাহায্যে আত্মা কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়।

আর এই যে সংসার, এই যে পৃথিবী, ইহা বৃথা মায়াময় "কিছু নয়", নয়, এটী কর্ম্মভূমি। এইখানে কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। এখানে কাজ না করিলে কাজ সম্পাদিত হয় না বা ফুরায় না; সুতরাং এ'টী "কিছু নয়" নয়, এ'টী কর্ম্মভূমি। এ সংসার অসার নয়, এ'টী সার পূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে কাজ করিলেই তবে আমরা সেখানে পাই, এখানে কর্ম্মক্ষম হইলেই আমরা সেখানের অধিকারী হই। এখানকার কর্ম্মেই আমাদের সেখানকার অধিকার, এখানে মুক্ত হইলে তবে আমরা সেখানে মুক্ত হইতে পারি, এখানে উন্নতি করিতে পারিলে, তবে আমরা সেখানে উন্নত-পদ লাভ করিতে পারি। সুতরাং এ'টা "কিছু নয়" নয়, এ'টা কর্ম্মক্ষেত্র; এখানে আমরা কিছু কাজ করিতে আসিয়াছি। বৃথা দিন গুজরান এজীবনের উদ্দেশ্য নয়। ঘুমাইয়া কাটাইলে কাজ শেষ হইবে না। কাজ করিলে তবে কাজ শেষ হইবে। এ

দুনিয়াটা কিছু নয় বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, যাহা কিছু এখানেই করিতে হইবে। আর যদি করিতে চাও, তবে তোমাকে কাজ করিতে হইবে। বৃথা কুসংস্কারের বোঝা মাথায় করিয়া ভিক্ষুকের বেশে বেড়াইলে চলিবে না, সত্যের ভাণ করিয়া কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া ঘুমাইলে চলিবে না, রজোগুণের সাধনা করিতে হইবে—তোমাকে তোমার উন্নত করিতে হইবে। আর যদি তাহাই করিতে হয় তবে তোমার সর্ব্বপ্রকার সংস্কার দরকার এবং সমাজসংস্কার তন্মধ্যে প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য। এবং তাহা হইলে সামাজিক সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের মূলাধার বাল্যবিবাহপ্রথা একেবারে সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে। যতপ্রকার অত্যাচার অবিচার সমুদয়ের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। বৃথা শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না, শাস্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করিতে হইবে, তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। কারণ দেখা যায়, যে পর্য্যন্ত এদেশে সয়ম্বর-বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত আমরা উন্নত গর্ব্বিত এবং যশস্বী ছিলাম; আর যখন হইতে এই দেশে বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তদবধি আমাদের অধঃপতনের সূচনা হইয়াছে। তৎকাল হইতে আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসিয়াছি এবং তাহারই ফলে আ'জ আমরা এমন হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এই বাল্যবিবাহ প্রথা যাহাতে সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা অবশ্য করিতে হইবে। এখন দেখা যা'ক এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন।

বাল্যবিবাহপ্রথা সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন ?

পূর্ব্বকালে এদেশে এ হিন্দু সমাজে বিবাহ বলিতে সয়ম্বর প্রথারই প্রচলন ছিল। তখন শাস্ত্রকারদের আদেশ এই ছিল যে, ষোল বৎসর হইতে চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীপক্ষে এবং পঁচিশ হইতে আটচল্লিশ পর্য্যন্ত পুরুষ পক্ষে বিবাহের উত্তম সময়। ইহার মধ্যে স্ত্রীপক্ষে ষোল এবং পুরুষপক্ষে পঁচিশ বৎসরে বিবাহ নিকৃষ্টকল্প বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। আঠারো অথবা কুড়ি বৎসর বয়স্কা যুবতীর সহিত ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর বয়সের পুরুষের বিবাহ মধ্যমকল্প বিবাহ বলিয়া অবধারিত হইত। তা'র পর চব্বিশ বৎসরের স্ত্রীর সহিত আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পুরুষের বিবাহ উৎকৃষ্টকল্প বিবাহ বলিয়া অনুমিত হইত এবং যে দেশে এইপ্রকার বিবাহবিধি উত্তম বলিয়া অবধারিত হইত এবং এই সুদীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাভ্যাসে ব্যয়িত হইত, সেই দেশই সুখপূর্ণ, আর যে দেশে ইহার অনুরূপ এবং বাল্যাবস্থায় অযোগ্য স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে সেই দেশ দুঃখপূর্ণ হইয়া যায়। কারণ ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাগ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহের বিশুদ্ধতা হইতে সকল বিষয়ই বিশুদ্ধ হয় এবং উহার দোষ হওয়াতে সর্ব্বপ্রকার দোষই ঘটিয়া উঠিয়া থাকে। কেন না, ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চরিত্র গঠন এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং যত বেশী দিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে ও বিদ্যাভ্যাস করিবে, দৈহিক এবং মানসিক উন্নতি ততই অধিক হইবে। কারণ, বীর্য্য ধারণেই দেহের বৃদ্ধি। যত অধিক সময় বীর্য্য ধারণ করিবে

দেহ তত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং তত অধিক বলশালী হইবে। আর যত অধিক সময় বিদ্যাভ্যাস করিবে মানসিক উন্নতি তত অধিক হইবে। অপ্রাপ্তবয়সে বিবাহ করিলে বীর্য্য ক্ষয় হেতু দেহ অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না ইহা অতি সহজে অনুমেয়, আর অপ্রাপ্তবয়সে বিবাহ করিলে যে বিদ্যাভ্যাসে বিঘ্ন জন্মে একথাও অস্বীকার করিবার যো নাই। সুতরাং অল্প বয়সে বিবাহ উভয় শারীরিক এবং মানসিক অপকার এবং অবনতির মূল। মুনি শ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি সুশ্রুতে বলিয়াছেন :—

ঊনষোড়শবর্ষায়াম-প্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিম্।
যগ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরঞ্জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

সুশ্রুত শারীরস্থানে অঃ ১০॥

অর্থাৎ ১৬ বৎসর বয়সের স্ত্রীতে ২৫ বৎসর বয়সের পুরুষে যদি গর্ভাধান করে তবে গর্ভ কুক্ষিস্থ হইয়া বিপদ ঘটায়, মানে পূর্ণকাল পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ে থাকিয়া উৎপন্ন হয় না। কিম্বা উৎপন্ন হইলেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না, বা বাঁচিয়া থাকিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। অতএব বাল্যাবস্থায় স্ত্রীর গর্ভাধান করিবে না।

সমুদয় শাস্ত্রোক্ত নিয়ম এবং সৃষ্টিক্রম দেখিলে মনে হয় যে স্ত্রী এবং পুরুষের বয়স যথাক্রমে ১৬ এবং ২৫ বৎসরের কম হইলে গর্ভাধানের উপযুক্ত হয় না।

এইজন্যে পূর্ব্বকালে অধিক বয়সে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। একারণ মনু বিবাহে স্ত্রীর বয়স সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥

মনুঃ ৯।৯০।

অর্থাৎ কন্যা রজস্বলা হইয়া তিন বৎসর যাবৎ পতির অন্বেষণ করত আপনার সদৃশ পতিগ্রহণ করিবে। প্রতি মাসে রজোদর্শন হইলে তিন বৎসরে ছত্রিশবার রজস্বলা হইয়া পরে বিবাহ করা কর্ত্তব্য এবং ইহার পূর্ব্বে কিছুতেই নহে। আর বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনুঃ ৯।৮৯।

মানে যদি বালক বালিকা মৃত্যু পর্য্যন্তও অবিবাহিতা থাকে সেও ভাল তথাপি অসদৃশ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ হওয়া কখন উচিত নহে। ইহা হইতে এই বুঝা গেল, যে উক্ত বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া অথবা অসদৃশ পাত্রে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। ইহাও বুঝা যায় যে, বিবাহ ছেলে এবং মেয়ের অধীন হওয়া উচিত। পিতামাতা মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হওয়াটা তাঁহাদের অধীন হওয়া উচিত নয়। কেন না, বিবাহ ছেলে এবং মেয়ের, ইহাতে তাহাদেরই অধিকার। কারন, যদি তাহারা বিবাহিত জীবনে পরস্পর

পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন না থাকিতে পারে অথবা না হয়, তাহাদের মধ্যে যদি প্রসন্নতার অভাব পরিদৃশ্যমান হয়, তবে তাহাদের জীবন বড়ই দুঃখময় হইয়া উঠিবে। তাহারা সংসারে উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে না। কাজে কাজেই ঠিক একইরূপ গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব বিশিষ্টের সহিত বিবাহ হওয়া উচিত। কেন না, তাহা যদি না হয়, তাহাদের মন প্রাণ যদি একভাবে অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে সংসারে শ্মশান সৃষ্টি হয়। তা'ই মনু সদৃশ খুঁজিয়া লইতে বলিয়াছেন। আর যেহেতু তাহাদের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব পিতা মাতা হইতে তাহারাই অধিক জানে সুতরাং সদৃশ খুজিয়া লইতে পিতা মাতা অপেক্ষা তাহারাই অধিক-তর সক্ষম হইবে। সুতরাং বিবাহ বিবাহার্থীদেরই অধীন থাকা সর্ব্বতোভাবে উচিত। কারণ, তাহা না হইলে সংসারে অপ্রসন্নতার সম্ভাবনা, আর তাহা সংসারীর পক্ষে সর্ব্বনাশের কারণ। এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন :—

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈধ্রুবম্॥

মনুঃ ৩৬০।

অর্থাৎ যে সংসারে স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর প্রসন্ন থাকে সেই সংসারে আনন্দ, লক্ষ্মী, এবং কীর্ত্তি অবস্থান করে। আর যে কুলে সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ হয় সে কুলে দুঃখ, দারিদ্র এবং নিন্দা উপস্থিত হয়। অতএব সদৃশ খুঁজিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেই বালক এবং বালিকাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

কেননা, তাহা না হইলে তা'দের পক্ষে সদৃশ খুঁজিয়া লওয়া সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু বাল্যবিবাহে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আট বৎসরের বালিকার পক্ষে সদৃশ স্বামী খুঁজিয়া লওয়া সম্ভবপর হইতে পারে কিরূপে? অতএব তাহাদের বয়স অধিক হওয়া উচিত এবং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া যাহাতে তাহারা সম্যকরূপে সদৃশ খুঁজিয়া লইতে পারে তাহাই করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে সেইরূপই হইয়া থাকিত। আর তাহার ফলে আমরা পূর্ব্বে উন্নত, গর্ব্বিত এবং যশস্বী ছিলাম। আর এখন এই বাল্যবিবাহের পরিণামে আমরা কি? অবনত, ঘৃণিত ও পতিত।

কিন্তু এই বাল্য-বিবাহপ্রথা কোথা হইতে আসিল?

শাস্ত্রে ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না, তবে যে দুই একটী শ্লোক এ সম্বন্ধে দেখা যায় তাহা প্রক্ষিপ্ত এবং নিতান্তই আধুনিক বলিয়া অনুমান হয়। আছে;—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাচ রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ ১॥
মাতা চৈব পিতা তস্যা জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ২॥

এই শ্লোক পরাশরোক্ত বলিয়া লিখিত। ইহার অর্থ এই যে, কন্যার অষ্টমবর্ষ বয়সে গৌরী, নবমবর্ষে রোহিণী, দশমবর্ষে কন্যা এবং তাহার পরে রজস্বলা বলিয়া কথিতা। দশমবর্ষে বিবাহ না

দিয়া রজস্বলা দেখিলে পিতা, মাতা এবং ভ্রাতা সকলেই নরকে পতিত হ'ন। কিন্তু এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত এবং সন্ত লিখিত বলিয়া বোধ হয়। শুধু এইটী নয়, এইরূপ আরও কতকগুলি শ্লোক আছে এবং তাহারাও যে প্রক্ষিপ্ত এবং অধুনা প্রণীত কিন্তু কোনও এক-জন প্রধান মুনি কর্ত্তৃক প্রণীত এরূপ উল্লিখিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শাস্ত্র এইরূপই পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছে এবং তৎ-পরেও বলিয়াছে ও বলিতেছে। দুদিকেই শাস্ত্রের দোহাই! এক্ষেত্রে কি করা যাইতে পারে? এ অবস্থায় সমাজের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক তাহাই কি কর্ত্তব্য নয়? বীর্য্যধারণে বলবান হওয়া যায়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অকালে অপরিপক্ক বীর্য্য স্খলন, ও স্খলন উপযোগী ব্যবস্থা যে অন্যায় ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণা না হইলে, তাহার দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত না হইলে, সে যে সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দীর্ঘজীবী সন্তান প্রসব করিতে পারিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। বাল্যবিবাহ প্রথায়ও তখন একটী রকম ছিল। পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাভ্যাসাদি সমাপন করিয়া তৎপরে আট বৎসর বয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতেন এবং নিজের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবানু-যায়ী সেই বালিকাকে গড়িয়া লইতেন। তিনি সংযমী ছিলেন, নিরুদ্বেগে তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত—পূর্ণযৌবনা হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। তখন স্ত্রীর শিক্ষার ভার তদীয় পিতামাতার উপর থাকিত না, তাহার স্বামীর উপরে ন্যস্ত হইত। কিন্তু আজ আর কি তাহাই হইতেছে, না, হইতে পারে? আমাদের যুবকেরা

কি সংযমী? তাহাদিগকে কি ২৫।৩০।৩৫ কিংবা ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়? ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে দেওয়া হয়? তাহারা কি সেইরূপভাবে শিক্ষিত হইয়া থাকে? না, তাহাদের চরিত্র সেইরূপভাবে গঠিত হইয়া থাকে? কি উত্তর? না; বলিতে হইবে—স্বীকার করিতে হইবে যুবকেরা আর সেরূপ ভাবে শিক্ষিত, গঠিত বা অনুপ্রাণিত হয় না। যদি তাহাই না হয়, তবে তাহাদের সহিত—সেই অসংযমী যুবকদের সহিত এই অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের বিবাহ দেওয়ায় কি ফল আশা করা যাইতে পারে? কি আশা করা উচিত? কি হইতেছে? এখন দেখ কি হইতেছে? আজ এ অধঃপতনের কারণ কি? আজ আমাদের এ দৈহিক ও মানসিক অধঃপতনের কারণ কি? বাল্যবিবাহ নয় কি? আর চেয়ে দেখ সেদিনের ছবি! চেয়ে দেখ এদেশী লোকের সে সেকালের চিত্র খানি—যেদিন এদেশে সয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত ছিল! তখন লোকে সন্তানগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিত। তাহারা ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত, পাত্রাপাত্র এসব বিবেচনা করিতে পারিত, সন্তানেরা তখন সংযমী ও সাধু হইত এবং তাহাদিগকে সেইরূপ করাই পিতা মাতার কর্ত্তব্য বলিয়া অনুমিত হইত। কিন্তু বিবাহ যাহা তাহাদের, যাহার ফলাফল তাহাদেরই ভোগ করিতে হইবে, তাহা সর্ব্বদাই তাহাদের অধীন থাকিত। কন্যা আপনার পতি আপনার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবানুযায়ী সদৃশ দেখিয়া আপনি খুঁজিয়া লইত এবং বরও তাহাই করিত। অসদৃশ বিবাহ হইতে পারিত না, সংসারে শশ্মানের ছায়া দেখা যাইত না। ইহাই সয়ম্বর প্রথা।

এইরূপই তৎকালের পিতামাতার কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত ছিল। তাহারা অন্যায় অধিকার লইতে যাইয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ অশান্তিময় করিতেন না। তাঁহারা জানিতেন সন্তানের শিক্ষার জন্য তাঁহারা দায়ী, কিন্তু তাহাদের বিবাহের জন্য নয়। বিবাহ সন্তানদের, সুতরাং তাহা তাহাদেরই অধীন। সেখানে তাহারা নিজের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে যাইয়া—আপনাদের মতানুযায়ী পুত্রবধু সংগ্রহ করিতে যাইয়া সন্তানের বিবাহিত জীবনে অশান্তির সম্ভাবনা রাখিতেন না। কেননা, তাহাদের প্রকৃতি, গুণ ও কর্ম্ম ঠিক তাহাদেরই অনুরূপই যে ইহার কোনও প্রমাণ নাই, সুতরাং তাহারা যে তাঁহাদের মনোমত কন্যা সংগ্রহ করিবেন, সে কন্যা সর্ব্বাংশে পুত্রের মনোমত না হইতে পারে, এবং যদি তাহা না হয় তবে, স্বীয় পুত্রের বিবাহিত জীবন দুঃখময় হইবে—তাহার সংসার সুখের হইতে পারিবে না। পিতামাতা ইহা চায় না, তাঁহারাও চাহিতেন না। শাস্ত্রকাদের মতও তখন ঠিক সেইরূপই ছিল। সন্তানেরা শিক্ষিত হইলে আপন আপন গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবানুযায়ী সদৃশ পাত্র আপনি খুঁজিয়া লইবে। কেন? কারণ, স্বামী স্ত্রী যদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন না থাকেন, যদি তাহাদের ভিতরে প্রসন্নতার অভাব হয়, তবে তাহারা দুঃখী হইবে, তাহাদের সংসার দুঃখময় হইবে, সুখের হইবে না। আর যদি উভয়ের ভিতরে প্রসন্নতা বর্ত্তমান থাকে, যদি তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদাসর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে, তবে তাহারা সুখী হইবে ও তাহাদের সংসারও সুখময় হইবে; সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রসন্নতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

কেননা, তাহা না হইলে, শুধু সংসার সুখময় হয় না তাহা নহে, তাহাদের সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করণের কোন ফলই হয় না। তাই শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।

নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ মনুঃ ৯।৮৯।

মানে যদিও বালক এবং বালিকা মৃত্যুপর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে সেও উৎকৃষ্ট তথাপি অসদৃশ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট স্ত্রীপুরুষের বিবাহ কখনও হওয়া উচিত নহে। সুতরাং দেখা যায় যে সন্তানগণকে এরূপ শিক্ষা দান করিবে, এতটা শিক্ষিত করিবে যে, তাহারা তাহাদের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবানুযায়ী সদৃশ ব্যক্তি খুঁজিয়া লইতে পারে। তাহা হইলেই দেখা যায় তাহাদের অধিক সময়—অধিক বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না, তাহারই সাহায্যে তাহারা আপন আপন বিদ্যা, বিনয়, শীল, রূপ, আয়ু, বল, কুল ও শরীরের পরিমাণ অনুযায়ী যথাযোগ্য ব্যক্তি অন্বেষণ ও পরীক্ষা করিয়া লইতে পারিবে। পূর্ব্বে যখন এদেশে এ সমাজে সয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এইরূপই ছিল। আর তাহার ফলে তাহাদের সন্তানাদি যাহা উৎপন্ন হইত তাহারা সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হইত। তাহারা সাহসী হইত, সৎকর্ম্মপ্রিয় হইত, সদাচারী হইত, সত্যবাদী হইত, অসত্য এবং অন্যায়ের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারিত। তাহাদের আত্মবিশ্বাস ছিল, অন্তঃকরণ অতি বড় ছিল। এ সব তৎকালীন সয়ংবর-বিবাহপ্রথার ফল।

সামাজিক শিক্ষা দরকার।

সৎশিক্ষা, সৎউপদেশ এবং সত্যাচরণের অভাবই যে সমাজে এরূপ বিড়ম্বনা উপস্থিত হইবার কারণ, তাহাতে আর ভুল নাই। সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াই যে আমাদের এই অধঃপতন হইয়াছে, একথা বোধ হয় অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। লোকে যেরূপ সংসারে এবং যে প্রকার সংসর্গে লালিত পালিত এবং বর্দ্ধিত হয়, সেই সংসার এবং সংসর্গে সংসর্গানুযায়ী তাহার চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে এবং তাহাদের শিক্ষাই তাহার শিক্ষার বিষয় হইয়া থাকে এবং সে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া থাকে। চোরের সন্তান সাধারণতঃ দেখা যায় চোরই হইয়া থাকে, এবং সাধুর সন্তানও সাধু হইয়া থাকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যে দৃষ্ট না হয় তাহাও নহে। সে সংসর্গ সুবাতাসেই হইয়া থাকে। মানে, একজন চোরের পুত্র যদি কিয়দ্দিবস সাধুসঙ্গে বাস করিতে পারে, কিংবা করে, তবে তাহারও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং সেও আস্তে আস্তে সাধু হইতে থাকে। তেমনি একজন চরিত্রবান্ সত্যবাদী, এবং সুশিক্ষিতের সন্তানও যদি অসৎসঙ্গে অবস্থান করে, তবে তাহারও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে এবং সেও কালে একজন ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত ডাকাত, চোর বা বদ্‌মাইস হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শুধু জন্মস্থানের গুণেই লোকে সুন্দর চরিত্রবান্, সত্যবাদী এবং সাধু হইতে পারে না, সংসর্গের ফলে অধিকাংশটা হইয়া থাকে। সংসর্গের দোষ বা গুণে অনেক সময়েই

দেখা গিয়াছে বংশানুক্রমিক চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; আমাদেরও হইয়াছে তাই। কিন্তু পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে হইলে সামাজিক শিক্ষা সর্ব্বোপরি কার্য্যকরী। অতএব যদি আমরা আমাদের সমাজের এবং দেশের উন্নতি কামনা করি তাহা হইলে আমাদের সামাজিক শিক্ষা-পদ্ধতি, আচার, নীতি, আদেশ প্রভৃতি উন্নত হওয়া দরকার। যদি তাহা করা যায় তাহা হইলে আমাদের আর অধিক ভাবিবার কিছু থাকিবে না।

সামাজিক শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত?

সামাজিক শিক্ষা দরকার, কিন্তু সেই সামাজিক শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, সমাজের লোকদিগকে কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইবে, তাহারা কি কি শিখিবে, কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে সমাজের সভ্যসমষ্টি সমাজভুক্ত জনসাধারণের উপকার হয় এবং দেশের উন্নতি হয় তাহা ভাবিবার বিষয়। অঙ্ক, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বর্ত্তমানে আমরা না পড়িতেছি তাহা নহে, আমরা অঙ্কও করিতেছি, ইতিহাসও পড়িতেছি, সাহিত্যও পড়িতেছি, দর্শনও দেখিতেছি এবং বিজ্ঞানচর্চ্চাও যে একবারে না করিতেছি তাহা নহে, কম আর বেশী এ সবই কিছু কিছু হইতেছে; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এ সব পড়িয়াও আমাদের বিশেষ কোন উপকার বা উন্নতি হইতেছে না। যদি ইহাদ্বারা আমাদের বিশেষ কোন উপকার না হইল বা ইহার সাহায্যে যদি আমরা উন্নত না হইলাম, তবে ইহাতে আমাদের সমাজিক উন্নতির পক্ষে সহায়তা করিতেছে

এমন কিছু অনুমান করা যায় না। ইহা দ্বারা আমাদের সমাজিক এমন কোন উন্নতি হইতে পারে না। সুতরাং এ শিক্ষা যে সমাজকে উন্নত করিবার পক্ষে সামাজিক শিক্ষা ইহা স্বীকার করা যায় না। তবে একথাও ঠিক যে সাহিত্য ছাড়া আমরা সমাজকে উন্নত করিতে সক্ষম হইতে পারিব না। সাহিত্য দ্বারাই সমাজকে শিখাইতে হইবে। কিন্তু সাহিত্যের প্রাণ এখন যেরূপ আছে সেরূপ থাকিলে চলিবে না, পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। তবে একটী কথা এই যে, আমরা সব সময়েই সাহিত্যের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে পারি না এবং সাহিত্যের উপদেশ লইয়া চলি না। তাহা হইলেই দেখা যায় যে অঙ্ক, সহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, এ সমুদয় আমাদের সামাজিক শিক্ষারপক্ষে যথেষ্ট নহে, আর কিছু চাই, অথবা দরকার। কিন্তু কি দরকার তাহাই এখন বিশেষ রূপে ভাবিবার বিষয়। শিক্ষা দরকার। শিক্ষার অভাবে সামাজিক লোকের এরূপ চরিত্রবিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে। এ শিক্ষা বলিতে যে আমি কেতাব পড়া লেখা পড়া শিখা—সে সব কিছু অর্থ করিতেছি না, এ শিক্ষা স্বতন্ত্র রকমের। অতি প্রথমে আমাদের সত্য কথা বলিতে শিখা দরকার। এ সম্বন্ধে আমরা পুস্তক পাঠে সংখ্যাতীত বার উপদেশ পাইয়াছি। অনেক গ্রন্থে আমরা সত্যবাদিতার উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ লইয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও দেখিতে পাই, আমরা সত্যবাদী হইতে পারি নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারি গ্রন্থ পাঠে যেসব উপদেশ পাওয়া যায় তাহা বাস্তব জগতে সব সময় কার্য্যকারী হইতে দেখা যায় না। সেই দ্বিতীয়

ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, ইউনিভারসিটীতে যাইয়া ৩।৪টা পাশ করা পর্য্যন্ত "সত্য কথা বলা ভাল" এইরূপ শুনিয়া আসিয়াছি এবং পড়িয়া আসিয়াছি "সদা সত্য কহিবে।" কিন্তু কার্য্যে দেখিতেছি সদা মিথ্যা চলিতেছে। সুতরাং সে পড়াতে বা শুনাতে লাভ নাই। উপদেশ পাইলে কি হইবে? অভ্যাস করা চাই। সমাজে সমাজভুক্ত লোকদিগকে সত্য কথা বলিতে অভ্যাস করাইতে হইবে, সেই অভ্যাস চাই। কল্পনায় বিচরণ করিলে চলিবে না, হাতে কলমে হইতে হইবে,—কাজ করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। কথায় বলিলে চলিবে না, কাজে করিতে হইবে; "সত্য কথা বল" বলিলে চলিবে না, সত্য কথা বলাইতে হইবে।

প্রথমে সমাজভুক্ত লোকদিগকে সত্য কথা বলিতে শিখাইতে হইবে। তাহারা যাহাতে মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া সত্য বলিতে অভ্যাস করে তদ্বিষয়ে যত্ন লইতে হইবে। সত্যবাদী হওয়া সকলেরই দরকার, কেন না, ইহাতে অনেক গুলী বিষয় লুকাইয়া আছে। প্রথম, যদি আমি জানি যে আমি যে কার্য্য করিতেছি তাহা "করি নাই" একথা বলিতে পারিব না—করিয়াছি বলিতে হইবে, তাহা হইলে আমি যাহা করিতেছি তাহা সৎকর্ম্ম হওয়া দরকার, কেননা, বলিবার বেলায় আমার কৃতকর্ম্ম যদি লজ্জাস্কর বা নিন্দনীয় হয়, তবে জিজ্ঞাসা করিলে আমি যখন প্রকাশ করিব তখন আমাকে লজ্জিত হইতে হইবে এবং ত্রুটি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আমি কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই তাহা সৎ কি অসৎ, ভাল কি মন্দ, কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, তাহা ভালরূপ চিন্তা করিয়া

জনসমাজে তবে সেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইব। কারণ, কেহই আপন কৃতকর্ম্মের জন্য ক্রটী স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না, অথবা জনসমাজে যাহার জন্য লজ্জিত হইতে হইবে সেরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে সর্ব্বদা সত্য কথা বলা যদি অভ্যাস হয়, তবে কেহ অন্যায় কিংবা নিন্দনীয় কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতে পারে না। কেননা, করিলে, তাহাকে তাহা স্বীকার করিতে হইবে এবং তজ্জন্য লাঞ্ছিত ও নিন্দনীয় হইতে হইবে।

দ্বিতীয়—সত্যবাদী হইলে সংসাহসী হইতে হইবে; কারণ, যে সত্য কথা বলিবে সে সৎসাহসী হইতে বাধ্য। কেননা, যদি কেহ ভ্রমবশতঃ কিংবা অন্য কোন কারণে অন্যায় অথবা নিন্দনীয় কার্য্য করিয়া থাকে, তবে যখন সেই বিষয় তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা যাইবে তখন তাহার সত্য কথা বলিতেই হইবে। কেন না, সে সত্যবাদী। সে মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না। সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া যাহাই করিয়া থাকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই যে স্বীকার করা, ইহাতে যে সাহসের সাহায্যে সে আপন কৃত কার্য্যের বিষয় বলিয়া থাকে, সে সাহস কম নয়। অন্যায় কার্য্য করিয়াও তাহা স্বীকার করিতে সাহস করাটা নিতান্ত কম কথা নয়। কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে সত্যবাদী সর্ব্বত্রই সৎসাহসী।

তৃতীয়—সত্যবাদী প্রায় সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায় চরিত্রবান্। যাহারা সতত সত্য কথা বলে তাহাদের চরিত্র ভাল না হইয়া পারে না। কেন না, তাহারা যাহাই করিবে তাহাদের

কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে এবং যেহেতু তাহারা জানে যে তাহারা তাহাদের কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে অথবা তাহাদের অন্যের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা, তাহারা "করি নাই" বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে না, সুতরাং তাহারা যে কার্য্য অথবা অপরের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে তাহা প্রশংসনীয় কার্য্য ও ভাল ব্যবহার না হইয়া পারে না। সুতরাং তাহারা অন্যের সহিত মিলিতে মিশিতে অথবা কোনরূপ কার্য্যে আসিতে বিশেষ সতর্কতার সহিত করিয়া থাকে এবং সেই সমস্ত ভাল না হইয়া মন্দ কিছুতেই হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যাহারাই সত্যবাদী, তাহারাই, কেবল দুই একটী স্বতন্ত্র সংঘটন ব্যতীত, চরিত্রবান।

চতুর্থ—সত্যবাদী প্রায় সর্ব্বদাই সদ্‌বিবেচক ও বুদ্ধিমান্। কারণ, তাহারা জানে যে তাহারা যে কার্য্য করিবে তাহা স্বীকার করিতে হইবে, অথবা যাহাই করুক না কেন, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন হইলে স্বীকৃত হইতে হইবে, বলিতে হইবে, "করিয়াছি", সুতরাং তাহারা কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই বিশেষরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবেচনা করিয়া—বিচার করিয়া দেখিয়া তবে তাহা করিয়া থাকে। কাজে কাজেই তাহারা চিন্তাশীল, সদ্‌বিবেচক, ন্যায়বান্, সদ্‌বিচারক এবং বুদ্ধিমান্ না হইয়া পারে না। কেন না, সদসদ্ ভাল-মন্দ ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি বিবেচনা করিতে করিতে তাহাদের চিন্তাশক্তি বাড়িয়া যায় এবং তাহাতেই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্প্রসারতা লাভ করিয়া থাকে। অতএব দেখা যায় সত্যবাদী সদ্‌বিবেচক, ন্যায়-পরায়ণ, ও বুদ্ধিমান্ না হইয়া পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে সর্ব্বপ্রথমে সমাজভুক্ত লোকদিগকে সত্য কথা বলাইতে অভ্যাস করা রূপ শিক্ষাই প্রথম দরকার। কেন না, এক সত্য কথা বলিতে অভ্যাস করিলেই সচ্চরিত্র, সৎসাহসী এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানী হওয়া যায়। সুতরাং সমাজে প্রথম এবং প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়ই সত্য কথা বলিতে অভ্যাস করা।

সমাজে দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় বিনয়। সকলেরই বিনয়ী হওয়া নিতান্ত দরকার; কিন্তু সমাজভুক্ত লোকদিগকে বিনয়ী হইতে হইলে যে একবারে গোবর্দ্ধনাচার্য্য বা গাধা সাজিতে হইবে তাহা নহে। কিংবা বিনয়ী হইলেই যে লোকে সৎসাহসী হইবে না, সর্ব্বদা শান্ত সুশীল ছেলেটী হইবে তাহা নহে। বিনয় ভদ্রতা ও সৎসাহসিকতার প্রতিবাদী নহে। মহাবীর নেপোলিয়ান অতি সাহসী পুরুষ ছিলেন, অনেক যুদ্ধে আপনিই তিনি অগ্রে গমন করিয়া সৈন্য পরিচালনা করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি অতিশয় সাহসী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে বিনয়ী ছিলেন না তাহা নহে। রাস্তার মাঝখানেও কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি অধিকতর অবনত হইয়া প্রতি অভিবাদন করিতেন।

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় সাহসী লোক ছিলেন। শুনিয়াছি একদিন তিনি এই কলিকাতায় মাননীয় গভর্ণর জেনারলের সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া পাহারাওয়ালা তাঁহার নিকট তাঁহার নামের কার্ড চাওয়ায় তিনি তথা হইতে ক্রোধিত হইয়া চলিয়া আসিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাতেই লোক আসিয়া

তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করাতে তিনি তখন আর না ফিরিয়া বলিয়া গেলেন যে দেখা করাটা আমার তেমন বিশেষ কিছুর জন্যই দরকার ছিল না, এ দেখা তাঁহাদেরই জন্য। কিন্তু যদি কার্ড দিয়াই দেখা করিতে হয়, তবে না দেখা করিলে কি হইতে পারে না? এদেশে তৎকালে যে গভর্ণর জেনারল ছিলেন তিনিও অতিশয় ভদ্র এবং সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দরজা হইতে ফিরিয়া যাওয়ার সংবাদ শুনিয়া কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য পাল্‌কী পাঠাইয়া দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গভর্ণর ভবনে লইয়া যা'ন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মানকরেন। বিদ্যাসাগর বাস্তবিক খুব সাহসী লোক ছিলেন, অবশ্য সৎসাহসী। কিন্তু তা'ই বলিয়া তিনি যে বিনয়ী ছিলেন না এরূপ নহে। তাঁহার সহিত কেহ দেখা করিতে গেলে তিনি এরূপ ব্যাবহার করিতেন যে তাহাতে লোক মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না।

বিনয়ী হওয়া নিতান্ত দরকার। লোকে সত্যবাদী এবং সৎসাহসী হইয়াও যদি বিনয়ী না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক সময় অনেক রূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় দশটা টাকায় যাহা না করে, একটী মিষ্টি কথা কিংবা বিনীত ব্যবহার তাহা করিয়া থাকে। সুতরাং সমাজভুক্ত লোকদিগকে বিনয়ী হইতে শিখাইতে হইবে। কিন্তু সেখানে সাবধান হইতে হইবে যে বিনয়ী হইতে লোকে না বোকা বনিয়া যায়। গাধা অতি শিষ্ট, শান্ত এবং নিরীহ জীব। অতি বিনয়ী—কেহ কাছে গেলেই

অমনি চো'ক বুঁজিয়া বিনম্রতা জানায় ; কিন্তু তা'ই বলিয়া কি কেহ গাধার মত হইতে চায় ? তা'ই বলিতেছি যে, বিনয়ী হইতে হইলে যে বোকা, বর্ব্বর কিংবা বিনয়ী গর্দ্দভ হইতে হইবে, তাহা নহে, বিনীত হইতে হইলেই যে সৎসাহস থাকিবে না, তাহা নহে। বিনয়ী হইয়াও সৎসাহসী হওয়া যায় এবং তাহাই দরকার।

এখন দেখা যাইতেছে যে, সত্যবাদিতার সহিত বিনম্রতা মিশ্রিত হইলে সোনায় সোহাগা হইল। এক সত্য কথা বলিতে অভ্যাস করাইতে পারিলেই প্রায় সমস্তই করা হয়। কেন না, এক সত্য কথা বলিবার অভ্যাস হইলে তাহাকে সৎসাহসী, সচ্চরিত্র, সাধু, জিতেন্দ্রিয়, চিন্তাশীল, ন্যায়পরায়ণ, সদ্‌বিবেচক এবং বুদ্ধিমান্ হইতে হইবে। কারণ, সত্যবাদী কখনও অসত্য বলিতে পারিবে না। সুতরাং কোন ক্রমে কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিলে তাহাকে তাহা সাহস করিয়া বলিতে হইবে এবং যেহেতু সে অন্যের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে সে ব্যবহার অন্যায় কিংবা অপ্রশংনীয় হইলে তাহাও প্রকাশ করিতে হইবে সুতরাং সে চরিত্রহীন হইয়া থাকিতে পারে না, যদি কোন অন্যায় কর্ম্ম তাহার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা তাহার স্বীকার করিতে হইবে ; সুতরাং সে কখনও অসাধু হইতে পারে না। যদি না ভাবিয়া সে কোন কার্য্য করে তজ্জন্য যদি কোন রূপ অন্যায়ের সংঘটন হয়, তাহা তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং না ভাবিয়া সে কোন কাজ করিতে পারে না। এইরূপ সব বিষয়েই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে

এক সত্য কথা বলিতে অভ্যাস করা যাইতে পারিলেই সব রকম শিক্ষায় শিক্ষা দেওয়া হইল। সত্যবাদিতায়ই সৎসাহসিকতা, সৎ-চরিত্রতা, সাধুতা, চিন্তাশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, এবং বুদ্ধিমত্তা এ সমুদয়ই সন্নিহিত রহিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে সত্য কথা বলাইতে অভ্যাস করাইতে পারিলেই সব রকম শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত হইল। আর তাহার সহিত বিনম্রতা যদি যোগ হয়, তবে বাস্তবিকই সোনায় সোহাগা হইল। অতএব সামাজিক শিক্ষা বলিতে গেলে সত্য কথা বলাইতে এবং বিনয়ী হইতে অভ্যাস করাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল।

শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়াও দরকার। কিন্তু সে সমস্ত উহ্য রাখিয়া গেলে চলিবে না, তাহাদের সত্যার্থ প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে এবং যাহাতে সেই সমুদয় শাস্ত্রোপদেশ সাধারণের পক্ষে সাহায্যকরী হয় তদ্‌বিষয় চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র গ্রন্থাদি যাহা কিছু আছে তাহাদের প্রায় সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কিন্তু জনসাধারণ সেই সংস্কৃত ভাষা একবারেই জানে না। সুতরাং ঐ উপকারী শাস্ত্রসমুদয় যাহাতে আপন আপন ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়া সকলের পক্ষে সমভাবে সাধ্যানুযায়ী বোধগম্য হইবার উপযুক্ত হয় তদ্‌ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে সামাজিক শিক্ষা, যাহা দরকার, তাহা যথেষ্ট হইল। মনে রাখিতে হইবে, সামাজিক শিক্ষা সুন্দর রূপে সম্পাদিত না হইলে আমরা উন্নতির আশা করিতে পারি না। সামাজিক শিক্ষা এইরূপ না হইলে আমাদের উদ্ধার নাই। অতএব সমাজভুক্ত

লোক সমূহ যাহাতে সত্য কথা বলিতে অভ্যাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন এবং তাহা হইলে সমাজ উন্নতিসোপানে দণ্ডায়মান হইতে পারে।

তাই বলিতেছি, যদি এদেশের মঙ্গল চাও, যদি এ সমাজের মঙ্গল চাও, যদি এ জনসমষ্টির উন্নতি আকাঙ্ক্ষা কর, তবে সমাজ সংস্কার কর, সমাজের গলদ বাহির করিয়া দাও, কুসংস্কার পরিত্যাগ কর, সমাজের পাপ দূরীভূত কর, বাল্যবিবাহ নিবারণ কর—এ হিন্দুসমাজ পুনর্জ্জীবিত হ'ক। এদেশের লোক আবার সত্য কথা কহিতে শিখুক, সত্যব্রত হউক, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রস্তুত হউক; ইহারা বলিষ্ঠ হউক, তেজীয়ান হউক, ত্যাগী হো'ক, দয়াশীল হোক; ইহাদের অন্তঃকরণ প্রশস্ত হো'ক, ইহারা ক্ষমবান্ হো'ক—ক্ষমতাশীল হো'ক; মিছা বাঁধন কেটে দাও, ইহারা মুক্ত হো'ক, বর্দ্ধিত হো'ক, সঞ্জীবিত হো'ক। মানুষ কোথায় কোন দিন অস্পৃশ্য হইয়া থাঁকে, তুমিও যে মানুষ আমিও সেই মানুষ এবং অন্যেও সেই মানুষ। তুমিও যে অন্ন জলে বর্দ্ধিত, জীবিত এবং পরিপুষ্টিত, অন্যেও তাই। তোমারও যেরূপ প্রাণ আছে, অন্যেরও তাই; তুমিও যে প্রণালীতে যে প্রকারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ আর একজন মানুষও ঠিক সেইরূপ করিয়াছে। তবে সে তোমার নিকট অস্পৃশ্য হইবে কিরূপে? তোমার পক্ক অন্ন সে স্পর্শ করিলে তুমি খাইবে না কেন? সে পানীয় জলপাত্র তোমার করে দিলে তুমি তাহা স্পর্শ করিবে না কেন? সে তোমার গৃহে প্রবেশ করিলে তুমি তাহা গঙ্গাজল দ্বারা পবিত্র করিবে কেন? তুমি তাহাকে ঘৃণা করিবে

কেন? ভগবান্ তোমাকেও যেরূপ মানুষ করিয়াছেন, তাহাকেও সেইরূপ করিয়াছেন, তুমিও যাহা সেও তাহা। তোমার যেমন পঞ্চ-ভৌতিক দেহে আত্মার সংযোগে তুমি, সেও পঞ্চভৌতিকমানবীয় দেহে আত্মাসংযোগে মানুষ—সেও মানুষ! তবে তুমি তাহাকে ঘৃণা করিবে কেন? তবে বলিতে পার সংস্কারে লোককে উত্তম এবং অধম করিয়া থাকে; যে কুকর্ম্ম করিয়া কুসংস্কারে আপনাকে ডুবাইয়া অস্পৃশ্য হইয়াছে, তাহাকে তুমি স্পর্শ করিবে কেন? তদুত্তরে এই বক্তব্য, যদি তাহাই হয়, যদি সেই সংস্কার লইয়াই কথা হয়, তবে তোমার পুত্র অথবা তুমি কিংবা তোমার স্বজনগণ অথবা তোমার স্বজাতির মধ্য হইতে কেহ যদি কুসংস্কারাপন্ন হইয়া কুক্রিয়া রত হয় এবং অসৎ কর্ম্মে আপনাকে নিয়োজিত করে এবং দিন দিনই পাপের অন্তস্তলে আপনাকে নিমজ্জিত করে, তবে তাহাকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিবে না কেন? তবে সে কেন অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না? তাহা হইলে কেন জন্ম ক্ষেত্র ধরিয়া বিচার করিবে? সে বেলায় কেন পাপকে আপন আঁচলের আড়ালে পুষিয়া রাখিবে? আবার অন্যদিকে তোমার বংশোদ্ভূত যদি কেহ খৃষ্টান অথবা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় এবং সর্ব্বদা আপনাকে সত্যশীল, ন্যায়পরায়ণ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাখে, তাহাকে সমাজে রাখিবে না কেন? তাহাকে কেন অস্পৃশ্য বলিয়া অন্দরের বাহিরে আশ্রয় দিবে? একই ক্ষেত্রে, একদিকে সংস্কার মানিবে আর একদিকে মানিবে না? একদিকে ক্ষেত্র মানিবে আর একদিকে মানিবে না কেন? একজন যদি শত শত কুকর্ম্ম করিয়া

তাহার ফলে গলিতকুষ্ঠ ময় কলেবর হয়, এবং যাহাকে নিতান্ত সামান্য লোকেরও স্পর্শ ত ভাল, দেখিতে ভয় হয়, তাহাকে সমাজে রাখিবে, তা'র পাপরাশিকে অবাধে বহন করিবে, সেই অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিবে, ঘৃণিত হইলেও তাহাকে ঘৃণা করিবে না, কিন্তু তদীয় ভ্রাতাই যদি আবার চরিত্রবান, সুশিক্ষিত, ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মশীল ও সত্যব্রত হয়, কিন্তু সে যদি মুসলমান, খৃষ্টান অথবা অন্য কাহারও সহিত প্রকাশ্যে আহার করে, তবে তাহাকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দাও! এ কি প্রকার বিচার! সত্যের মর্য্যাদা নাই, অসত্যের! সাধুর সম্মান নাই, অসাধুর! চরিত্রবানের আদর নাই, আদর কুকর্ম্মরত পাষণ্ডের! এ কিরূপ বিধান? ইহাতে কি সমাজ সঞ্জীবিত থাকিতে পারে? তুমি তোমার ঘরে বসিয়া যা ইচ্ছা তা'ই করিতে পার, তাহাতে কোন দোষ নাই, তুমি তোমার সমাজে থাকিয়া সমাজের অনতিদূরে বেশ্যালয়ে মুর্গী, মট্‌ন্, বীফ্, পর্ক, যা' ইচ্ছা তা'ই ভোজন করিতে পার এবং বাহাদুরী লওয়ার ছলে তৎ-সমুদয় গল্পও করিতে পার, তাহাতেও তোমার জাত যাইবে না, কিন্তু যদি কেহ, এমন কি, বিদ্যা-অর্জ্জনের জন্যও বিদেশ যাত্রা করে তবুও তুমি তা'কে একঘরে করিতে ছাড়িবে না! একি তোমার রীতি? এ কি তোমার আচার? এবং—এ কি তোমার বিচার? যদি দেশের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা কর, যদি সমাজের মঙ্গল কামনা কর, যদি এ জনসমষ্টির কোনও রূপ মঙ্গল করিবার বাসনা থাকে, তবে এসমস্ত কু-আচার, কু-অভ্যাস এবং কু-কর্ম্ম হইতে বিরত হও। সমাজের লোক মুক্ত হো'ক, মুক্তপ্রাণে কাজ করুক; সত্যনিষ্ঠ

হো'ক, কর্ত্তব্যপরায়ণ হো'ক। ছেড়ে দাও, আর জীর্ণসূত্র ধ'রে রেখোনা।

এ ভ্রূণ হত্যার বাড়াবাড়ি আর কত দিন চলিতে থাকিবে? বাল্য বিবাহ প্রথানুসারে বালিকাদিগকে বিবাহ দিবে এবং যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই তাহারা বিধবা হইবে, আর আজীবন তাহারা দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিবে! কে'উ বা মহাকষ্টে মান রাখিবে আর অধিকাংশ আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া আশ্বাস লইবে! একদিকে বারাঙ্গণাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিবে, অন্যদিকে সমাজে ভ্রূণহত্যার বাড়াবাড়ি চলিতে থাকিবে! এ কেমন কথা? বিধবারা বিবাহ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহারা বিবাহিত জীবনের সমস্ত কার্য্য করিতে অধিকারী হইবে, তাহাতেও সমাজচ্যুত হইবে না! তাহারা সমাজে থাকিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করুক, সমাজে দিন দিন ভ্রূণহত্যা হ'তে থা'ক, কোন দোষ নাই! এ কেমন কথা? প্রকৃত কার্য্য সম্পাদনে দোষ নাই, কথায় দোষ? সমাজে থাকিয়া গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হো'ক, তৎফলে ভ্রূণহত্যা বা যা'ইচ্ছ তা'ই হো'ক, কোন দোষ নাই, তুমি শেষে তাহাকে কাশীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু তবু তাহাকে পুনরায় বিবাহ দিয়া সংসার সুখ ভোগ করিতে দিবে না! এ তোমার কেমন বিচার? আর না দাও, তোমার অন্যায় অধিকার পরিত্যাগ কর এবং ন্যায়তঃ তুমি যে অধিকারের অধিকারী তাহা গ্রহণ কর। বাল্যকালে তাহাদিগকে বিবাহ দিও না। তাহাদের বিবাহে তোমার কোন অধিকার নাই। বিবাহ তাহাদের, তোমাদের নয়। সুতরাং তোমার তাহাতে কোন

অধিকার নাই, তুমি অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইও না। তাহাদের যাহা তাহা তাহাদেরই অধীনে থাকিবে। তুমি সেখানে যাইও না। তাহাদের প্রতি তোমাদের যে কর্ত্তব্য তাহাই কর। সুশিক্ষায় এবং সৎশিক্ষায় সুশোভিত কর। তাহাদের আপন মঙ্গলামঙ্গল, ন্যায় অন্যায়, শুভাশুভের বিচার করিবার ক্ষমতা হো'ক। তাহাদের অধিকার তাহারা ভাল করিয়া ভোগ করিতে সক্ষম হো'ক। যদি দেশের উন্নতি চাও, যদি সমাজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, যদি এ জন-সমষ্টির মঙ্গল কামনা কর; তবে তোমার অন্যায় অনধিকারচর্চ্চা ছে'ড়ে দাও, অত্যাচার অবিচার করিও না। ভগবানের ঐসমুদয়ে অধিকার, তোমার কোন অধিকার নাই। যদি দেশের মঙ্গল চাও —যদি দশের মঙ্গল চাও, যদি সমাজের মঙ্গল চাও, তবে এ অন্যায় বন্ধন কেটে দাও। সে জীর্ণসূত্র ছিঁড়ে ফেল। লোকে সত্যের উপর দাঁড়াইতে শিখুক—লোকে ন্যায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখুক, লোক অন্যায়, অপ্রকৃত এবং অবিচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হো'ক; হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া যাইয়া এদেশীয় লোক আবার ভাই ভাইকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করুক; আবার আর একবার এই সুনীল আকাশতলে এদেশবাসী শান্ত মনে শান্তির গীত গাহিতে থাকুক; আর একবার তাহারা উন্নত হইয়া আপনার যশকাহিনী জগতে বিঘোষিত করিতে সক্ষম হো'ক; আর একবার তাহাদের গৌরব গাথা জগতের মুখে গীত হো'ক; খুলে দাও ঐ বন্ধন, ছেড়ে দাও এ জীর্ণসূত্র, নামিয়ে ফেল এ কুসংস্কারের বোঝা! পরিত্যাগ কর—মুক্তকর! একবার এ জাতি, একবার এ সমাজ,

একবার এ দেশ মুক্ত প্রাণে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউক! তাহারা আর একবার প্রাণ খুলে প্রাণ ভরিয়া কাজ করিতে সক্ষম হো'ক—আবার একবার এ দেশী লোক শান্তির গান গাহিতে থা'ক্।